সূচিপত্র

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا (آل عمران-١٠٣)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (المستدرك للحاكم-٣١٨)

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

মাসিক আল-ইতিছাম

আল-ইতিছাম

১০ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা জুন ২০২৬

Web : www.al-itisam.com



পশ্চিমবঙ্গে BJP হুমকির মুখে বাঙ্গালী মুসলিমদের অস্তিত্ব

MONTHLY AL-ITISAM
Chief Editor : **ABDULLAH BIN ABDUR RAZZAK**
Published By : **AL-JAMIAH AS-SALAFIYAH**
Printed By : Al-Itisam printing press
Mailing Address : Chief Editor, Monthly AL-ITISAM,
Al-Jamiah As-Salafiyah, Dangipara, Paba, Rajshahi-6210
Mobile : 01407-021838, 01407-021839, 01407-021840
E-mail : monthlyalitisam@gmail.com

مجلة "الاعتصام" الشهرية السلفية العلمية الأدبية، الداعية إلى الاعتصام بالكتاب و السنة.
السنة:١٠، ذو الحجة و محرم ١٤٤٧-٤٨هـ/ يونيو ٢٠٢٦م العدد:٨، الجزء :١١٦
تصدر عن الجامعة السلفية بنغلاديش
رئيس التحرير: فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرزاق

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪৭-৪৮ || ঈসায়ী ২০২৬ || বঙ্গীয় ১৪৩৩

ইংরেজি মাস	আরবী মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
জুন - ০১	জুল হিজ্জাহ- ১৩	সোমবার	৩.৪৫	৫.১১	১১.৫৭	৩.১৬	৬.৪১	৮.০৮
জুন - ০৫	জুল হিজ্জাহ- ১৭	শুক্রবার	৩.৪৪	৫.১০	১১.৫৭	৩.১৭	৬.৪৪	৮.১০
জুন - ১০	জুল হিজ্জাহ- ২২	বুধবার	৩.৪৪	৫.১০	১১.৫৮	৩.১৭	৬.৪৫	৮.১৩
জুন - ১৫	জুল হিজ্জাহ- ২৭	সোমবার	৩.৪৪	৫.১১	১১.৫৯	৩.১৮	৬.৪৭	৮.১৫
জুন - ২০	মুহাররম- ০৩	শনিবার	৩.৪৫	৫.১১	১২.০০	৩.১৮	৬.৪৮	৮.১৬
জুন - ২৫	মুহাররম- ০৮	বৃহস্পতিবার	৩.৪৬	৫.১৩	১২.০২	৩.২০	৬.৪৯	৮.১৭
জুন - ৩০	মুহাররম- ১৩	মঙ্গলবার	৩.৪৭	৫.১৪	১২.০২	৩.২১	৬.৫০	৮.১৭

জেলাভিত্তিক সময়সূচির পরিবর্তন

ঢাকা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
গাজীপুর	+২	+১	০
নারায়ণগঞ্জ	০	০	০
নরসিংদী	-১	-২	০
কিশোরগঞ্জ	-৩	-৩	০
টাঙ্গাইল	+১	+১	+৩
ফরিদপুর	+৩	+৩	+৩
রাজবাড়ী	+১	০	০
মুন্সিগঞ্জ	+১	০	০
গোপালগঞ্জ	+৫	+৩	+০
মাদারীপুর	+৩	+২	০
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+৩
শরিয়তপুর	+২	+১	০

ময়মনসিংহ বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
ময়মনসিংহ	-৩	-২	+২
শেরপুর	-২	-১	+৪
জামালপুর	০	০	+৫
নেত্রকোনা	-৫	-৪	+১

চট্টগ্রাম বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
চট্টগ্রাম	-২	-৩	-৬
খাগড়াছড়ি	-৪	-৬	-১০
রাঙ্গামাটি	-৩	-৫	-৯
বান্দরবান	-২	-৪	-১১
কুমিল্লা	-২	-৩	-৩
নোয়াখালী	০	-১	-৪
লক্ষ্মীপুর	+১	০	-৩
চাঁদপুর	+১	০	-২
ফেনী	-১	-৩	-৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৪	-৪	-২

সিলেট বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
সিলেট	-৯	-৮	-৩
সুনামগঞ্জ	-৭	-৭	-১
মৌলভীবাজার	-৮	-৭	-৪
হবিগঞ্জ	-৬	-৫	-২

রাজশাহী বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রাজশাহী	+৬	+৬	+৯
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৬	+৭	+১১
নাটোর	+৪	+৪	+৭
পাবনা	+৪	+৪	+৬
সিরাজগঞ্জ	+১	+১	+৫
বগুড়া	+৫	+৪	+৪
নওগাঁ	+৩	+৪	+৯
জয়পুরহাট	+১	+২	+৮

রংপুর বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
রংপুর	-১	০	+৯
দিনাজপুর	+১	+৩	+১১
গাইবান্ধা	-১	০	+৭
কুড়িগ্রাম	-৩	-১	+৭
লালমনিরহাট	-২	০	+১০
নীলফামারী	-১	+১	+১১
পঞ্চগড়	-১	+২	+১৩
ঠাকুরগাঁও	+২	+৪	+১৩

খুলনা বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
খুলনা	+৭	+৫	+২
বাগেরহাট	+৭	+৫	০
সাতক্ষীরা	+৯	+৭	+৩
যশোর	+৭	+৬	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৫	+৫
ঝিনাইদহ	+৬	+৫	+৫
কুষ্টিয়া	+৫	+৫	+৬
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭
মাগুরা	+৫	+৪	+৪
নড়াইল	+৫	+৪	+২

বরিশাল বিভাগ

জেলার নাম	ফজর	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
বরিশাল	+৪	+২	-১
পটুয়াখালী	+৫	+৩	-২
পিরোজপুর	+৬	+৪	০
ঝালকাঠি	+৫	+৩	-১
ভোলা	০	০	০
বরগুনা	+৬	+৪	-১

■ সূত্র : ইসলামিক ফাইন্ডার (www.islamicfinder.org) ■ গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Science, Karachi

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلة الإعتصام الشهرية

মাসিক আল-ইতিছাম

কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার এক অনন্য বার্তা

১০ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা, জুন ২০২৬ইং,
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, যিলহজ্জ-মুহাররম ১৪৪৭-৪৮

www.al-itisam.com

উপদেষ্টা
শায়খ আব্দুল খালেক সালাফী
শায়খ মুহাম্মাদ মোস্তফা মাদানী
শায়খ মুহাম্মাদ ইউসুফ মাদানী

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ

প্রধান সম্পাদক
আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক

সম্পাদক
মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল

নির্বাহী সম্পাদক
আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

সহকারী সম্পাদক
মো. আকরাম হোসেন
আব্দুল্লাহ মাহমুদ

বিভাগীয় সম্পাদক
মো: নাসির উদ্দিন, আল আমিন

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মোঃ নাইমুল ইসলাম

ফাতাওয়া হটলাইন: ০১৪০৭-০২১৮৪২ সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা

হাদিয়া ৩০/- (ত্রিশ টাকা) মাত্র

সার্বিক যোগাযোগ

প্রধান সম্পাদক
আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী, ৬২১০
সহকারী সম্পাদক ০১৪০৭-০২১৮৩৮
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ০১৪০৭-০২১৮৩৯

সার্কুলেশন ম্যানেজার
০১৭৫০-১২৪৪৯০, ০১৪০৭-০২১৮৪০ বিকাশ মার্চেন্ট
monthlyalitisam@gmail.com

সূচিপত্র

» **সম্পাদকীয় ॥ ০২**
» **কুরআনের গভীরে**
ন্যায়ের উপর অবিচল অবস্থান: ঈমানের অপরিহার্য দাবি ৩
-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল
» **প্রবন্ধ**
বিভিন্ন ইসলামী দল ও জামা'আতের সাথে যোগদান করার হুকুম ৭
মূল: ড. বাকর ইবনে আব্দুল্লাহ আবূ যায়েদ
অনুবাদ: আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী
কিতাবুল ইলম: জ্ঞান অর্জনের স্বরূপ ১২
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক
প্রসঙ্গ: দণ্ডবিধি ১৪
মূল: ড. আব্দুল আযীম আল-বাদাবী
অনুবাদ: হাফীযুর রহমান বিন দিলজার হোসাইন
কুরবানীর পর পরিচ্ছন্নতা: সচেতনতা ও ইসলামী দিকনির্দেশনা ১৬
-মো. আকরাম হোসেন
মুহাররম ও আশূরা: গুরুত্ব, করণীয় ও বর্জনীয় ১৭
-আবূ মাহদী মামুন বিন আব্দুল্লাহ
তীব্র গরমে মুমিনের পরীক্ষা: ইসলামের আলোকে তাপপ্রবাহের তাৎপর্য ২১
-ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ
পাপ-পুণ্য ২২
-সাঈদুর রহমান
» **হারামাইনের মিম্বার থেকে**
ব্যক্তি ও সমাজ সংশোধনের উপদেশ ২৩
» **কুরআনের মর্মবাণী**
রবের বাণী ২৬
-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক
» **উসওয়াতুন হাসানাহ**
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অতুলনীয় বিনয় ২৮
-হাসান আল-বান্না মাদানী
» **খুলুকুল মুসলিম**
ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম-এর সাথে একজন মুসলিমের আচরণ ৩১
মূল: সুলতান ইবনে আব্দুল্লাহ আল-উমরী
অনুবাদ: হুসাইন আহমাদ বিন সাইদুর রহমান
» **ফাযায়েলে আমল**
মানবকল্যাণে নেক আমল ৩২
-মাহবূবুর রহমান মাদানী (রাজশাহী)
» **সুন্নাতের সাথে প্রতিদিন**
মসজিদে গমন ও অবস্থানের সুন্নাতসমূহ ৩৩
-আল-ইতিছাম ডেস্ক
» **চিন্তাধারা**
দুই ঈদের মোহনা: স্মৃতির সেই অমলিন ঘ্রাণ আর আজকের যান্ত্রিক রোশনাই ৩৫
-আতাউল্লাহ বিন আবুল কালাম আজাদ
» **হেলথ কর্নার**
গরমে জন্ডিস: সচেতনতা হোক সুরক্ষার প্রথম ধাপ ৩৮
-ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ
» **জামি'আহ পাতা**
তাওহীদ বনাম শিরক: ঈমানের মূল চেতনায় সতর্কবার্তা ৩৯
-আবু সাঈদ সারোয়ার
» **কবিতা ॥ ৪১**
» **সংবাদ ॥ ৪২**
» **সওয়াল-জওয়াব ॥ ৪৪**



সম্পাদকীয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهُ

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির বিজয়: হুমকির মুখে বাঙালি মুসলিমদের অস্তিত্ব

ভারতের রাজনীতিতে গত তিন দশকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির উত্থান। একসময় মাত্র দুই আসনে বিজয়ী হওয়া দল বিজেপি আজ ভারতের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। গেরুয়া পতাকার এই উত্থান পশ্চিমবঙ্গেও তাদের বিজয়কেতন উড়িয়ে দিয়েছে। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি প্রায় অপ্রাসঙ্গিক ছিল। অথচ মাত্র এক যুগের ব্যবধানে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করেছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, বাঙালি অধ্যুষিত আরও দুটি রাজ্য—আসাম ও ত্রিপুরাও এখন বিজেপি-শাসিত। ফলে বাংলাদেশের চারপাশে কার্যত গেরুয়া বলয় তৈরি হয়েছে। এই উত্থান কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়; বরং প্রায় ১০০ বছরের দীর্ঘমেয়াদি সাংগঠনিক পরিকল্পনা, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এবং রাজনৈতিক কৌশলের ফল।

বিজেপির এই উত্থানের শুরুটা হয়েছিল Rashtriya Swayamsevak Sangh বা আরএসএসের মাধ্যমে। ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠন শুরু থেকেই ‘হিন্দু রাষ্ট্র’ ধারণাকে কেন্দ্র করে কাজ করে আসছে। তাদের লক্ষ্য ছিল কেবল নির্বাচন জেতা নয়; বরং সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, মিডিয়া এবং রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে হিন্দুত্ববাদী আদর্শের অধীনে নিয়ে আসা। বিজেপি মূলত এই সংগঠনেরই রাজনৈতিক শাখা।

প্রথমদিকে তাদের রাজনৈতিক সাফল্য ছিল খুবই সীমিত। কিন্তু বাবরি মসজিদ ইস্যুকে কেন্দ্র করে ‘রাম জন্মভূমি আন্দোলন’ বিজেপিকে জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রে নিয়ে আসে। ১৯৮৪ সালে দুই আসনের দল ১৯৯৬ সালে ভারতের সবচেয়ে বড় দলে পরিণত হয়। একটি আদর্শভিত্তিক সংগঠন ধৈর্য, সাংগঠনিক শক্তি এবং সাংস্কৃতিক প্রভাবের মাধ্যমে কীভাবে দীর্ঘমেয়াদে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে পারে, তার অন্যতম উদাহরণ আরএসএস ও বিজেপি। হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির মূল দর্শন ‘হিন্দুত্ব’—যার প্রধান তাত্ত্বিক Vinayak Damodar Savarkar। এই দর্শনে ভারতের জাতীয় পরিচয়কে হিন্দু পরিচয়ের সঙ্গে একীভূত করা হয়। মুসলিমরা সেখানে ‘সমান অংশীদার’ নয়; বরং ‘বহিরাগত’ হিসেবে বিবেচিত। তাদের দৃষ্টিতে মুসলিম মোঘল শাসনামল ছিল হিন্দুদের জন্য ‘দাসত্বের যুগ’। এই রাজনীতির বাস্তব উদাহরণ ইতোমধ্যে দেখা গেছে। বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে। বাবরি মসজিদের জায়গায় রাম মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে। ২০২৪ সালের ২২ জানুয়ারি সেই রাম মন্দির উদ্বোধন করা হয়।

কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদাও বাতিল করা হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা ছিল ভারতের সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদের অধীনে। বিজেপি ২০১৯ সালে সেটি বাতিল করে। অথচ এটি ১৯৫১ সাল থেকেই আরএসএসের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য ছিল। একই বছরে Citizenship Amendment Act (CAA) পাশ হয়। NRC-এর মাধ্যমে যারা ১৯৫২ সালের পূর্বের ডকুমেন্ট দেখাতে পারবে না, তাদের নাগরিকত্ব বাতিল হয়ে যাবে। আর CAA-এর মাধ্যমে অমুসলিমরা নাগরিকত্ব পাওয়ার সুযোগ পেলেও মুসলিমরা সেই সুবিধার বাইরে থাকবে এবং তাদের ‘বাংলাদেশি’ হিসেবে চিহ্নিত করে ভারত থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। এটি মুসলিমদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক বানানোর বৃহত্তর হিন্দুত্ববাদী প্রকল্পের অংশ।

আমাদের মনে রাখতে হবে, বাবরি মসজিদের জায়গায় রাম মন্দির নির্মাণ, কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা বাতিল, কিংবা NRC-CAA—এসব বিষয় একসময় ভারতের রাজনীতিতে অসম্ভব মনে হতো। অথচ বিজেপি তাদের দীর্ঘদিনের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী একের পর এক বাস্তবায়ন করেছে। সুতরাং, বিজেপি তাদের অন্যান্য ঘোষিত লক্ষ্য বাস্তবায়নের দিকেও অগ্রসর হবে। এর মধ্যে অন্যতম হলো ‘অখণ্ড ভারত’ ধারণা। ভারতের নতুন সংসদ ভবনে যে মানচিত্র প্রদর্শিত হয়েছে, সেখানে আফগানিস্তান থেকে আরাকান পর্যন্ত বিস্তৃত একটি বৃহত্তর ভারতের ধারণা প্রতিফলিত হয়েছে। তাই এটি বাংলাদেশের জন্য কেবল রাজনৈতিক বিষয় নয়; বরং একটি অস্তিত্বগত সংকট। একদিকে বাংলাদেশের অস্তিত্বের সংকট, অন্যদিকে ভবিষ্যতে আসাম বা পশ্চিমবঙ্গ থেকে মুসলিম বাঙালিদের বাস্তুচ্যুতির সম্ভাবনা তৈরি হলে তা বাংলাদেশের জন্য বড় হুমকি ও অর্থনৈতিক চাপ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

এত বড় চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ আজও মুক্তিযুদ্ধের নামে অভ্যন্তরীণ বিভাজন ও সেক্যুলার বাঙালি জাতীয়তাবাদের নামে হিন্দুত্ববাদী সংস্কৃতির পথেই এগিয়ে যাচ্ছে। অথচ এই সংকট মোকাবেলায় প্রয়োজন একটি শক্তিশালী জাতীয় আদর্শিক ভিত্তি। আর সেটিই হচ্ছে ইসলাম। ১৯৪৭ সালের সেক্যুলার ভারত যেভাবে ধীরে ধীরে কট্টর হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির দিকে অগ্রসর হয়েছে, তেমনি ১৯৪৭ সালে মুসলমানিত্বের নামে স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশের অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ইসলামভিত্তিক ঐক্য ও মূল্যবোধের দিকে ফিরে যাওয়া ছাড়া বিকল্প নেই। (প্র. স.)

www.al-itisam.com

কুরআনের গভীরে

ন্যায়ের উপর অবিচল অবস্থান: ঈমানের অপরিহার্য দাবি

-মুহাম্মদ মুস্তফা কামাল*

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনে কারীমে বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

সরল অনুবাদ: ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়বিচারের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হও, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদানকারী হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে হয় অথবা পিতামাতা কিংবা আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয়, সে ধনী হোক অথবা দরিদ্র। অতএব, আল্লাহ উভয়ের ব্যাপারে অধিক হকদার। তাই ন্যায়বিচার থেকে বিরত হওয়ার জন্য তোমরা খেয়ালখুশির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা সত্যকে বাঁকাও অথবা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত’ *(আন-নিসা, ৪/১৩৫)*।

তাফসীরে সা‘দীর আলোকে উক্ত আয়াতের শিক্ষা:

১. সর্বাবস্থায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা।

২. আল্লাহর হক্ব আদায় মানে তাঁর নেয়ামত পাপে নয়, বরং আনুগত্যেই ব্যবহার করা।

৩. পরিপূর্ণতা ও সততার সাথে মানুষের হক্ব আদায় করা।

৪. নিজের, পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়ের বিরুদ্ধেও সত্য সাক্ষ্য প্রদান করা।

৫. ধনী-গরীবের ভেদাভেদ না করে সবার সঙ্গে ন্যায়বিচার করা।

৬. আল্লাহ সব জানেন এবং বিচার দিবসে প্রতিফল দিবেন—এ বিশ্বাস হৃদয়ে জাগ্রত রাখা।

৭. ন্যায়বিচারই আসল তাক্বওয়া ও প্রকৃত দ্বীনদারিতার পরিচয়।

৮. নিজের খেয়ালখুশি ও প্রবৃত্তির অনুসরণই ন্যায়বিচারের প্রধান অন্তরায়।

৯. সত্য গোপন, তথ্যের বিকৃতি ও মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা গুরুতর পাপ।

১০. শুধু কথা, কাজ বা আচরণেই নয়; সিদ্ধান্তেও ন্যায়ের প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

শব্দ ও ভাষাগত দিকের অর্থ:

قَوَّامِينَ শব্দটি ‘قَوَّام’ শব্দের বহুবচন। এটি ‘قائم’ (দাঁড়ানো/ক্বায়েম থাকা) শব্দের অতিরিক্ত অর্থবোধক রূপ, এর অর্থ হলো এমন ব্যক্তি, যিনি কোনো কাজ সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে পরিপূর্ণ ও উৎকৃষ্টভাবে সম্পাদন করেন। এখানে শব্দটি দ্বারা ন্যায় প্রতিষ্ঠায় অবিচল, দৃঢ় ও ধারাবাহিকভাবে কাজ করা মানুষকে বুঝানো হয়েছে।

شُهَدَاءَ শব্দটি ‘شهيد’ শব্দের বহুবচন। ‘فعيل’ ওযনে এসেছে, যা স্থায়ী অভ্যাসগত গুণ বুঝায় (যেমন- كريم حكيم)। এর অর্থ এমন লোক, যারা সর্বদা ন্যায়ের সাক্ষ্য দেয় এবং সত্য কথা বলার অভ্যাস যাদের হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে।

القِسْط অর্থ ন্যায়বিচার তথা কথায়, কাজে ও বিচারে ন্যায়পরায়ণ থাকা।

আল্লাহ এখানে ‘كونوا’ (হও) শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা চিরস্থায়ী অভ্যাসের নির্দেশ দেয়। অর্থাৎ এক বা দুই বার নয়, বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ন্যায় প্রতিষ্ঠাকে অভ্যাসে পরিণত করতে হবে।

আয়াতের ব্যাখ্যা:

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দৃঢ়ভাবে ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো এবং সর্বদা সত্যের সাক্ষ্য দাও। কারও প্রতি শত্রুতা, বিদ্বেষ বা বিরক্তি যেন তোমাদেরকে কখনোই অন্যায়ের দিকে ধাবিত না করে। শত্রু হোক বা বন্ধু, আপনজন হোক কিংবা প্রতিপক্ষ- কাউকেই অবিচারের শিকার করো না; বরং সবার প্রতিই ন্যায়, সত্য ও সাম্যের আচরণ করো। ন্যায়বিচারই যেন তোমাদের স্থায়ী চরিত্রে রূপ নেয় এবং এভাবেই

১. প্রভাষক (আরবী), বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বরিশাল।

www.al-itisam.com

নিজেদের গড়ে তোলো। ইসলাম এমন জীবনব্যবস্থা নয়, যেখানে শত্রুর উপর অত্যাচার ও অন্যায় বৈধ; বরং ইসলাম ন্যায়বিচারকে দিয়েছে সর্বোচ্চ মর্যাদা।

অনেক সময় মানুষ মনে করে যে, শত্রুর সাথে কঠোর হওয়াই তাক্বওয়ার পরিচয়। কিন্তু কুরআন স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে যে, শত্রুর সাথেও ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখাই প্রকৃত তাক্বওয়ার অধিক নিকটবর্তী অবস্থা। এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রেও শত্রুর প্রতি সীমালঙ্ঘন করা নিষিদ্ধ। ইমাম যামাখশারী বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ প্রথমে নিষেধ করেছেন যে, বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে অন্যায়ের পথে ধাবিত না করে, এরপর সরাসরি ন্যায় প্রতিষ্ঠার আদেশ দিয়েছেন, তারপর ঘোষণা করেছেন যে, ন্যায়-ই তাক্বওয়ার সবচেয়ে নিকটবর্তী। এর অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত হলো যদি কাফেরদের প্রতিও এমন ন্যায়পরায়ণ হতে বলা হয়, তবে মুসলিম ভাইদের সাথে ন্যায়পরায়ণতা রক্ষা করা তো আরও বেশি অপরিহার্য।

আল্লাহ তাআলা তাঁর ঈমানদার বান্দাদের আদেশ করছেন যে, তারা যেন ন্যায়বিচারের উপর ক্বায়েম থাকে, এটি একটি অতিরিক্ত অর্থবোধক শব্দ, যা মুমিনের চরিত্রের স্থায়ী ভূষণ, এখান থেকে বিচ্যুত হওয়ার সুযোগ কোনো মুমিনের নেই। অর্থাৎ তারা দৃঢ়তার সাথে ন্যায়ের উপর অটল থাকে, ন্যায় থেকে ডানে–বামে কখনোই সরে যায় না। কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কার যেন তাদেরকে আল্লাহর ন্যায়ের পথ থেকে ফিরিয়ে না দেয় এবং কোনো কিছুই যেন তাদেরকে ন্যায়পরায়ণতা থেকে সরিয়ে না নেয়। বরং ন্যায় প্রতিষ্ঠায় অপরের কল্যাণকামিতায় তারা যেন পারস্পরের সহযোগী, সহায়ক, সহমর্মী এবং একে অপরের দৃঢ় সমর্থক থাকে।

তিনি বলেন, 'আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদানকারী হও', যেমন তিনি অন্যত্র বলেছেন, 'আল্লাহর জন্য সাক্ষ্য ক্বায়েম করো' *(আত-তালাক, ৬৫/২)*। অর্থাৎ সাক্ষ্য দাও আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। যখনই একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সাক্ষ্য প্রদান করা হবে, তখনই সাক্ষ্য হবে সঠিক, ন্যায়সংগত, পরিপূর্ণ সত্য, বিকৃতি-পরিবর্তন ও গোপন করা থেকে মুক্ত। এজন্যই বলা হয়েছে, 'যদিও তা তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই হয়' অর্থাৎ এমন হলেও সত্য সাক্ষ্য দাও, যদিও তার ক্ষতি তোমাদের নিজেদের উপর এসে পড়ে। অর্থাৎ সত্য সাক্ষ্য দাও, ছোট কিংবা বড় যে কারো ব্যাপারে, ধনী কিংবা গরীবের ব্যাপারে, পিতা-মাতা ও অন্যদের বিরুদ্ধেও সত্য সাক্ষ্য দাও।

এই মহান আয়াতের উদ্দেশ্য হলো বান্দাদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব সুদৃঢ় করা, সহযোগিতার বন্ধন শক্তিশালী করা এবং একে অপরকে সত্যের উপদেশ দেওয়ার মাধ্যমে ন্যায় ও তাক্বওয়ার পথকে সুদৃঢ় করা। একই সঙ্গে অন্যায়, অবিচার, পক্ষপাত ও খেয়ালখুশির অনুসরণ থেকে বিরত থাকার সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করাও এর উদ্দেশ্য। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা সৎকর্ম ও তাক্বওয়ায় পরস্পরকে সহযোগিতা করো এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ক্ষেত্রে পরস্পরকে কোনো সহযোগিতা করো না' *(আল-মায়েদা, ৫/২)*। এছাড়া তিনি আরও বলেন, 'সময়ের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে; তবে তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে' *(আল-আছর, ১০৩/১-৩)*। অর্থাৎ তারা পরস্পর ধৈর্যের উপদেশ প্রদান করেছে, কিন্তু কখনোই সত্য থেকে বিচ্যুত হয়নি।

এ ক্ষেত্রে নবী ﷺ-এর বাণী প্রণিধানযোগ্য, তিনি বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি বিষয় ভালোবাসেন— (ক) তোমরা তাঁর ইবাদত করো এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করো না, (খ) তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো, পরস্পর বিভক্ত হয়ো না এবং (গ) যাদেরকে আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর কর্তৃত্ব দান করেছেন, তাদের প্রতি সত্যের উপদেশ দাও'।[২]

আরেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা সবাই আল্লাহর দড়ি দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং বিভক্ত হয়ো না। আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর সেই অনুগ্রহ স্মরণ করো, যখন তোমরা একে অপরের শত্রু ছিলে, তখন তিনি তোমাদের অন্তরে ভালোবাসা ও ঐক্য সৃষ্টি করেছিলেন। ফলে তাঁর কৃপায় তোমরা পরস্পর প্রকৃত ভাইয়ে পরিণত হয়েছিলে' *(আলে ইমরান, ৩/১০৩)*।

অতএব, সব মুসলিমের উপর ওয়াজিব হলো সৎকর্ম ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করা, ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা এবং সত্যের উপদেশ দেওয়া। যেন আল্লাহ তাআলার নিম্নবর্ণিত বাণীতে মুসলিম উম্মাহর বৈশিষ্ট্য বাস্তবায়িত হয়, 'তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব, তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দাও, অসৎকাজ থেকে নিষেধ করো এবং আল্লাহর উপর ঈমান রাখো' *(আলে ইমরান, ৩/১০১)*। তাদের সর্বোত্তম জাতি হওয়ার পেছনে কারণ হলো- তাদের মাঝে ছিল পারস্পরিক উপদেশ, তাক্বওয়ায় সহযোগিতা, ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠা, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ।

২. ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৫; মুসনাদে আহমাদ, হা/৮৭৯৯।

www.al-itisam.com

এটাই দায়িত্ব! এ দায়িত্ব অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে, কারণ এটা এক মহা দায়িত্ব। মানুষের আত্মার স্বভাবেই মন্দের প্রতি প্রবণতা রয়েছে আর শয়তান তো মানুষকে সর্বদাই মন্দের দিকে আহ্বান করে। ফলে মানুষ অনেক সময় নিজের খেয়ালখুশি, ব্যক্তিগত স্বার্থ, আত্মীয়স্বজন ও প্রিয়জনের প্রতি পক্ষপাতিত্বের কারণে অন্যায়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তাই তাক্বওয়া, সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় পারস্পরিক সহযোগিতা, দৃঢ়তা ও অবিচল প্রতিশ্রুতি আবশ্যক।

যখন কোনো জাতি এই মহৎ গুণাবলি ধারণ করবে, এই বৈশিষ্ট্যের আলোকে জীবন পরিচালনা করবে; তখনই তারা প্রকৃত সুখ-সমৃদ্ধি অর্জন করবে, তাদের কল্যাণ ও স্বাচ্ছন্দ্যের দুয়ার উন্মুক্ত হবে, আল্লাহ তাদেরকে শত্রুর উপর বিজয় দান করবেন এবং পৃথিবীতে তাদের শক্তি, মর্যাদা ও কর্তৃত্ব সুদৃঢ় করে দিবেন। আর যখন সে জাতি যুলম করবে, অন্যায়ের পথে অগ্রসর হবে, সীমা অতিক্রম করবে; তখন তারা আল্লাহর গযব ও শাস্তির মুখোমুখি হবে এবং বিপদ, ফেতনা ও রক্তপাতের কবলে পতিত হবে।

আল্লাহ তাআলা মহাজ্ঞানী ও পরম প্রজ্ঞাময়। তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত হওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কখনো কখনো তিনি যালেমদেরকে অবকাশ দান করেন, কখনো কোনো জাতির মাঝে অন্যায় ও অত্যাচারের মাত্রা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়, তবুও তিনি তাদেরকে সুযোগ দেন। যেমন তিনি বলেন, ‘আমি তাদেরকে অবকাশ দিই, নিশ্চয়ই আমার কৌশল অত্যন্ত দৃঢ়’ *(আল-আ‘রাফ, ৭/১৮৩)*। এর পূর্বের আয়াতে তিনি আরও বলেন, ‘আমি ধীরে ধীরে তাদেরকে পাকড়াও করব, যেখানে তারা বুঝতেও পারবে না’ *(আল-আ‘রাফ, ৭/১৮২)*।

অতএব, বুদ্ধিমান ও সৎচিন্তার অধিকারী মানুষ যেন বিরোধীদের অপব্যাখ্যা, ভ্রান্ত প্ররোচনা বা সাময়িক অবস্থা দেখে বিভ্রান্ত না হয়। আল্লাহর দেওয়া এই অবকাশকে তারা যেন ধোঁকা মনে না করে এবং বেপরোয়া হয়ে না যায়। তারা যেন কখনোই এই ধারণা পোষণ না করে যে, এ অবাধ সুযোগের কারণে শাস্তি তাদের স্পর্শ করবে না। বরং আল্লাহ তাআলা সতর্ক করে বলেন, ‘তুমি কখনোই মনে করো না যে আল্লাহ যালেমদের কাজকর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ। তিনি কেবল তাদেরকে সেই দিনের জন্য অবকাশ দেন, যেদিন চোখসমূহ আতঙ্কে স্থির হয়ে যাবে’ *(ইবরাহীম, ১৪/৪২)*।

অনেক সময় যালেম তার যুলমের মধ্যেই মৃত্যুবরণ করে, সে দুনিয়ায় শাস্তি না পেলেও আখেরাতে অবশ্যই কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিন্তু প্রকৃত বুদ্ধিমান সেই মানুষ, যে নিজেই নিজের হিসাব গ্রহণ করে, ছোট-বড় প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর নির্ধারিত সীমারেখায় অবস্থান করে এবং নিজের খেয়ালখুশির উপর আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেয়। সুতরাং হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়বিচারের উপর অটলভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো। ধনী বা গরীব, আত্মীয় কিংবা শত্রু—সবার ব্যাপারেই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করো। গরীব বলে তার প্রতি অতিরিক্ত করুণা দেখিয়ে অন্যায়ে জড়িয়ে পড়ো না, আবার শত্রু বলে তার প্রতি কঠোরতা দেখাতে গিয়ে ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করো না; বরং সত্যের উপর দৃঢ় থাকো এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করো, সত্য বলতে গিয়ে নিজের ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিলেও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর অনুগত বান্দাদের জন্য মুক্তি ও কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করে দেন।

আর যখন বাবা-মা কিংবা আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে হয়, তখনও সত্য কথা বলো, তাদের প্রতি ভালোবাসা বা খাতিরের কারণে সত্য গোপন করো না। কারণ সত্যই সবার ঊর্ধ্বে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ধনী হোক কিংবা গরীব—তোমরা তাদের সম্পদ বা দারিদ্র্যের বিবেচনায় ন্যায়বিচার থেকে সরে যেয়ো না। কারণ আল্লাহই তাদের অভিভাবক, তিনি তাদের ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে অধিক হকদার ও সম্যক অবগত।

‘খেয়ালখুশির অনুসরণ যেন তোমাদেরকে ন্যায়পরায়ণতা থেকে বিচ্যুত না করে’—এর অর্থ হলো ব্যক্তিগত পক্ষপাত, জাতিগত বিদ্বেষ, রাগ, ঘৃণা ও আত্মিক প্রবৃত্তির মতো মানবিক বৈশিষ্ট্য যেন তোমাদেরকে ন্যায়বিচার ত্যাগ করতে বাধ্য না করে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘কোনো জাতির প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে ন্যায়বিচার থেকে বিরত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার করো, এটাই তাক্বওয়ার অধিক নিকটবর্তী’ *(আল-মায়েদা, ৫/৮)*।

এ বিষয়ে এক উজ্জ্বল উদাহরণ নবী ﷺ-এর ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি যখন খায়বারের ইয়াহূদীদের ফলমূলের হিসাব নিতে গিয়েছিলেন, তখন তারা তাকে ঘুষ দিতে চেয়েছিল। তখন তিনি বলেছিলেন, আমি এমন এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে এসেছি, যিনি আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। আর তোমরা আমার কাছে ঘৃতঅন্ত অপ্রিয়। কিন্তু তাঁর প্রতি আমার ভালোবাসা কিংবা তোমাদের প্রতি আমার ঘৃণা—কোনো কিছুই আমাকে ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। এ কথা শুনে তারা বলেছিল, এই ন্যায়বিচারের কারণেই আসমান ও যমীন দৃঢ়ভাবে টিকে আছে।[৩]

৩. আহমাদ, হা/১৪৯৫৩; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১২৩/৪।

www.al-itisam.com

তবে বিস্ময়ের বিষয় হলো ইয়াহূদীরা ন্যায়বিচারের মূল্য, মানবাধিকার ও সত্যের গুরুত্ব ভালোভাবেই জানে এবং নিজেরা তার সুফলও ভোগ করে; তবুও রাজনৈতিক স্বার্থ, অহংকার ও আধিপত্য বিস্তারের লালসা তাদেরকে যুলম, অন্যায় ও সত্য প্রত্যাখ্যানের পথে অগ্রসর করে। বিশেষ করে যখন তারা আল্লাহকে অস্বীকার করে, সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে, তখন সেটিই মানবতার জন্য বড় বিপদের কারণ হয়। এই একই আচরণ হিন্দুদের ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়। তারা সত্যকে চেনে ও জানে, তবুও সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতার পথকে প্রত্যাখ্যান করে। কারণ তারা মনে করে যে, আভিজাত্য ও স্বাতন্ত্র্যই তাদের মর্যাদা ও বিশেষত্বের প্রতীক, যা কেবল তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, জ্ঞান ও সত্যের পরিচয় থাকা সত্ত্বেও যখন কোনো জাতি বা গোষ্ঠী সচেতনভাবে সত্য প্রত্যাখ্যান করে, তখন তাদের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে। এ ভয়াবহ অবস্থা থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা।

পশ্চিমা শক্তি ও পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীলতাকে অনেকেই দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের একমাত্র উপায় মনে করে। তারা জঙ্গিবাদ, মৌলবাদ, উগ্রবাদ ইত্যাদি ট্যাগ ব্যবহার করে ইসলামী মূল্যবোধের ইতিবাচক উত্থানকে ঠেকাতে চায়। ক্ষমতার লালসা, নির্দিষ্ট মতাদর্শিক প্রভাব ও সংকীর্ণ স্বার্থ রক্ষার মানসিকতা তাদেরকে নতজানু নীতি অনুসরণের দিকে ধাবিত করে। এই ভীতিনির্ভর মনোভাব ও পরমুখাপেক্ষী চিন্তাধারা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌম অবস্থানকে দুর্বল করে দেয়।

আল্লাহ তাআলা সতর্ক করে বলেছেন, 'যারা মুসলিমদের বর্জন করে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নেয় এবং তাদেরই কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে, অথচ যাবতীয় সম্মান শুধু আল্লাহরই জন্য' *(আন-নিসা, ৪/১৩৯)*।

'আর যদি তোমরা সাক্ষ্যকে বিকৃত করো অথবা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও'—এ বিষয়ে মুজাহিদ ও সালাফদের বক্তব্য হলো বিকৃত করা মানে, সাক্ষ্যকে ঘুরিয়ে দেওয়া, পরিবর্তন করা, পরিষ্কার সত্যকে বদলে দেওয়া। আর মুখ ফিরিয়ে নেওয়া মানে, সাক্ষ্য গোপন করা অর্থাৎ সাক্ষ্য থেকে পুরোপুরি সরে যাওয়া।

তাদের দায়িত্ব হলো সত্য, পরিষ্কার, সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করা। তারা যেন সাক্ষ্যকে এমনভাবে অস্পষ্ট করে না বলে, যাতে তা কার্যকর না থাকে কিংবা সন্দেহজনক মনে হয় যেন গ্রহণযোগ্য না হয় অথবা তারা যেন সাক্ষ্য পুরোই গোপন না করে। এ দুটিই খেয়াল ও পক্ষপাতের ফল।

যে সাক্ষ্য দিতে পারে, অথচ গোপন করে সে বড় গুনাহগার। আল্লাহ বলেন, 'যে সাক্ষ্য গোপন করে, তার হৃদয় পাপী'। নবী ﷺ বলেন, 'সেরা সাক্ষী সেই, যে প্রয়োজনের সময় অনুরোধের আগেই সাক্ষ্য নিয়ে আসে'।[৪] তাই আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের কাজ সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত, তিনি তা অনুযায়ী প্রতিফল দিবেন'।

এর পরের আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি, তাঁর নাযিলকৃত কিতাবের প্রতি এবং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনো। আর যে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল এবং আখেরাতকে অস্বীকার করে সে কঠিন বিভ্রান্তিতে পড়ে'।

আল্লাহ মুমিনদেরকে আদেশ দিয়েছেন পূর্ণাঙ্গ ঈমান গ্রহণ করতে। এটি শুধু ঈমানের দাবি নয়; বরং ঈমানকে আরও শুদ্ধ করা, দৃঢ় করা, প্রতিষ্ঠিত করা এবং স্থায়ী করা। যেমন আমরা ছালাতে প্রতিদিন বলি, 'আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করো' অর্থাৎ হেদায়াতকে আরও শক্ত করো এবং তাতে আমাদেরকে অটল রাখো।

অতঃপর যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলদের প্রতি ও আখেরাতের প্রতি ঈমান অস্বীকার করবে, সে সরল পথ থেকে বহুদূরে সরে যাবে।

উপসংহার

ন্যায়বিচার, সত্যনিষ্ঠা ও তাক্বওয়া—এগুলো একটি জাতির অগ্রযাত্রা ও মর্যাদার প্রকৃত ভিত্তি। কুরআনের এ আয়াত আমাদের শিক্ষা দেয় নিজ স্বার্থ, আবেগ, পক্ষপাত ও ভয়ভীতি যেন কখনো ন্যায়বিচারকে পরাজিত করতে না পারে। ন্যায় প্রতিষ্ঠা শুধু একটি নৈতিক দাবি নয়, এটি আল্লাহ তাআলার সরাসরি নির্দেশ এবং ঈমানের অপরিহার্য শর্ত। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, যে জাতি সত্যকে ত্যাগ করে, অন্যায়কে আলিঙ্গন করে, ক্ষমতার মোহে ন্যায়বিচার ধ্বংস করে তাদের পতন অনিবার্য। আর যারা ন্যায়, সত্য, তাক্বওয়া ও আল্লাহর উপর নির্ভরতা দৃঢ় রাখে আল্লাহ তাদের জন্য সম্মান, সাফল্য ও বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন।

অতএব, আজ আমাদের দায়িত্ব হলো ন্যায়ের উপর দৃঢ় থাকা, সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা, খেয়ালখুশি ও পক্ষপাতের অনুসরণ ত্যাগ করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিকেই জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য বানানো। এভাবেই ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও উম্মাহ সত্যিকার কল্যাণ, শান্তি ও শক্তির পথে এগোতে পারে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ন্যায়বিচারে অটল থাকার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

৪. ছহীহ মুসলিম, হা/১৭১৯; ছহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৫০৭৯।

www.al-itisam.com

বিভিন্ন ইসলামী দল ও জামা‘আতের সাথে যোগদান করার হুকুম

মূল: ড. বাকর ইবনে আব্দুল্লাহ আবূ যায়েদ
পরিমার্জন: সা‘দ ইবনে আব্দুর রহমান আল-হুছায়্যিন
অনুবাদ: আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী*

(পর্ব-২)

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলাম-পূর্ব আরবে দলপ্রীতি ও গোষ্ঠীপ্রথা

ইসলাম-পূর্ব যুগে (জাহিলী যুগে) সামাজিক সহাবস্থানের প্রধান বন্ধন গড়ে উঠেছিল বংশধারা, ভৌগোলিক পরিচয়, গায়ের রং, পেশার বৈচিত্র্য এবং ভাষার ঐক্যের ওপর ভিত্তি করে।

আরব উপদ্বীপে এই ব্যবস্থা পরিচালিত হতো গোত্রীয় প্রথা এবং শহর ও মরুচারী উভয় অঞ্চলের গোত্রীয় সংহতির (আছাবিয়্যাহ/اَلْعَصَبِيَّةُ) মাধ্যমে। রক্ত ও বংশীয় সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করেই এটি টিকে ছিল। এর সূত্র ধরেই একটি গোত্র তার যাবতীয় উপাদান ও জীবন-জীবিকার উপকরণের ক্ষেত্রে এমন একজন নেতার অধীনে ঐক্যবদ্ধ হতো, যার শ্রেষ্ঠত্ব তারা নির্বাচনের মাধ্যমে অথবা প্রভাব-প্রতিপত্তির জোরে মেনে নিত।

আর এই গোত্রীয় সমাবেশগুলোর মূল বা কেন্দ্রীয় দল ছিল ‘কুরাইশ’। তাদের হাতেই ন্যস্ত ছিল হাজীদের পানি পান করানো (سِقَايَةٌ), কা‘বার চাবি সংরক্ষণ ও গিলাফ পরানো (حِجَابَةٌ), হাজীদের আতিথেয়তা (رِفَادَةٌ), পরামর্শ সভা আয়োজন (نَدْوَى) এবং রণপতাকা বহন (لِوَاء)-সহ বিভিন্ন ধর্মীয়, সামরিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব। এছাড়া তারা অন্যদের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা, ভ্রাতৃত্ববন্ধন, অধিকার সুরক্ষা, আক্রমণ প্রতিহত করা এবং রক্তের বদলা নেওয়ার ক্ষেত্রেও যুক্ত থাকত।

কখনও আবার সেখানে পার্থিব স্বার্থ রক্ষা ও রক্তপাত বন্ধের উদ্দেশ্যে ভিন্ন প্রকৃতির কিছু জোট বা দল দেখা যেত। যেমন: ‘হিলফুল মুতায়্যাবিন’ (حِلْفُ الْمُطَيَّبِيْنَ), ‘লা‘ক্বাতুদ দাম’(لَعْقَةُ الدَّمِ) এবং ‘হিলফুল ফুযূল’(حِلْفُ الْفُضُوْلِ)। তবে এতকিছুর পরও সেই গোত্রীয় জোটগুলোর মাঝে এমন কোনো ব্যাপকতা ছিল না, যা আদনান, কাহতান কিংবা কুযা‘আ-এর মতো বিশাল বংশীয় ধারাগুলোকে এককভাবে ধারণ করত; বরং তা ছিল কেবল ছোট ছোট শাখা ও নির্দিষ্ট গোত্রীয় ও উপগোত্রীয় গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবে পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোথাও এগুলোর তেমন বিশেষ প্রভাব ছিল না। যেমন: কাহতানীদের ওপর আদনানীদের কিংবা ইয়ামানীদের ওপর কায়সীদের গর্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করা— বিষয়গুলো এভাবেই চলত।

এই গণ্ডি যত প্রশস্ত কিংবা সংকীর্ণ হোক, এর মূল ভিত্তি ছিল ‘আছাবিয়্যাহ’ বা অন্ধ গোত্রপ্রীতি। এটি এমন এক শব্দ, যা মূলত: বিভাজন, অনৈক্য এবং ধ্বংসাত্মক গোত্রীয় সংঘাতকে নির্দেশ করে, যার মূলে থাকে নিছক বংশমর্যাদার বড়াই ও গোত্রীয় সংকীর্ণতা। এটি ছিল এক গোত্রের বিরুদ্ধে অন্য গোত্রের কিংবা এক জনপদের বিরুদ্ধে অন্য জনপদের একপাক্ষিক অন্ধ আবেগ। মূলত এই গোত্রপ্রীতিগুলোর সামগ্রিক ফল ছিল পারস্পরিক বিবাদ ও চরম বিশৃঙ্খলা।

ফলাফল বিবেচনায় এটি অনেকাংশেই বর্তমান মুসলিমবিশ্বে প্রচলিত ‘জাতীয়তাবাদ’ ও ‘দেশপ্রেমের’ চটকদার স্লোগানের মতো। তবে নবুঅত-পূর্ব জাহিলী যুগের সেই গোত্রপ্রীতির মাঝেও এমন এক ধরনের আভিজাত্য ও চারিত্রিক নৈতিকতা বিদ্যমান ছিল, যা জাতীয়তাবাদের নামে একত্রিত হওয়া বর্তমানের এই লক্ষ্যহীন ও উচ্ছৃঙ্খল জনতা বা সস্তা স্লোগানধারীদের মাঝে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এরা না পেরেছে ইসলামের সাহায্যে এগিয়ে আসতে, আর না পেরেছে এই অন্তঃসারশূন্য ভ্রান্ত স্লোগানগুলোকে চূর্ণ করতে।

৫. বিএ (অনার্স), উচ্চতর ডিপ্লোমা, এমএ এবং এমফিল, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; অধ্যক্ষ, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

www.al-itisam.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গোত্রীয় দলপ্রীতির বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা

আরব উপদ্বীপের গোত্রগুলোর জীবনযাত্রার মূল ভিত্তি ছিল ‘আছাবিয়্যাহ’ বা গোত্রীয় অন্ধ সংহতির উত্তাল প্রবাহ। নবী ﷺ তাঁর রবের নির্দেশে এই রূঢ় বাস্তবতাকে মোকাবিলা করেন এবং সমাজকে ‘ইসলামের মমতা’ (رحم الإسلام), ‘ঈমানী ভ্রাতৃত্ব’ (أخوة الإيمان) ও ‘তাক্বওয়ার বাণী’ (كلمة التقوى)-এর দিকে ধাবিত করার মাধ্যমে এক আমূল পরিবর্তন আনেন। এই লক্ষ্য অর্জনে কুরআনে বহু আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

‘হে মানব-সকল! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর তাদের উভয় থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে (অধিকার) চেয়ে থাকো। আর ভয় করো রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক’ *(আন-নিসা, ৪/১)*।

তিনি আরও বলেন,

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ﴾

‘তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের সেই বিধানই বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন, যার আদেশ তিনি দিয়েছিলেন নূহকে এবং যা আমি আপনার প্রতি অহী করেছি এবং এবং ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম, তা হলো, তোমরা দ্বীন ক্বায়েম করো এবং এতে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আপনি মুশরিকদেরকে যেদিকে আহবান করছেন, তা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়’ *(আশ-শূরা, ৪২/১৩)*।

তিনি আরও বলেন,

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾

‘নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাবান, যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাক্বওয়াবান’ *(আল-হুজুরাত, ৪৯/১৩)*।

ইসলামের পতাকাতলে এই ঐক্যের রূপান্তরের মাধ্যমেই ‘ওয়ালা ও বারা’ (কার সাথে বন্ধুত্ব হবে আর কার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হবে, সেই আক্বীদা) নির্ধারিত হয়। একটি শক্তিশালী ও প্রভাবশালী অনুমোদিত নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের অধীনে এই ঐক্য গড়ে ওঠে, যার উপর বায়‘আত বা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করা হয় এবং শ্রবণ ও আনুগত্যের মাধ্যমে তার প্রতি অনুগত থাকা হয়। ফলে কোনো মুসলিম ব্যক্তির পক্ষেই এমন অবস্থায় রাত কাটানো বৈধ নয় যে, তার ঘাড়ে এই আনুগত্যের বায়‘আতের কোনো অঙ্গীকার নেই।

এর কারণেই সেই প্রাচীন গোত্রীয় অন্ধ সংহতির বন্ধনগুলোতে ফাটল ধরে ও তা বিলীন হয়ে যায় এবং নবী ﷺ বন্ধ করে দেন গোত্রীয় অন্ধ সংহতির সব পথ। বাকী রয়ে যায় শুধু তাওহীদের পতাকা-এর সুদৃঢ় বন্ধন, যার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে ‘ওয়ালা ও বারা’ (আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বন্ধুত্ব ও শত্রুতা), সহযোগিতা এবং ভ্রাতৃত্ব। আর একারণেই যখন জনৈক ছাহাবী বানূ মুছতালিকের যুদ্ধে ডাক দিলেন, ‘হে মুহাজিরগণ!’ এবং অন্যজন বললেন, ‘হে আনছারগণ!’, তখন নবী ﷺ উচ্চৈঃস্বরে তাঁদেরকে সম্বোধন করে বললেন, أَبِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ دَعُوهَا، فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ ‘তোমরা কি জাহেলিয়াতের ডাক দিচ্ছ? অথচ আমি তোমাদের মাঝেই উপস্থিত রয়েছি! এসব ত্যাগ করো, কারণ এগুলো অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত (বর্জনীয়)’।[৬]

এভাবে যখনই দলপ্রীতি বা গোত্রপ্রীতির কোনো বহিঃপ্রকাশ ঘটত, নবী ﷺ তখনই তা কঠোরভাবে দমন করতেন। আর এ নীতির উপরই তিনি মহান রফীকের (আল্লাহর) সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত অবিচল ছিলেন। সুতরাং প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য হলো দলপ্রীতি ও উপদলীয় কোন্দলমুক্ত হয়ে পূর্ণ ইসলামকে ধারণ করা এবং সকল মুসলিমকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আগলে রাখা।

বাগদাদী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মৃত্যুর সময় মুসলিমগণ দ্বীনের মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখায় একই মানহাজ বা পদ্ধতির ওপর ঐক্যবদ্ধ ছিলেন; কেবল তারা ছাড়া, যারা প্রকাশ্য আনুগত্য করলেও অন্তরে কপটতা লুকিয়ে রেখেছিল’।[৭]

৬. বুখারী ও মুসলিম, হাদীছটি জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত; দেখুন: ইক্বতিযাউছ ছিরাতিল মুস্তাক্বীম, পৃ. ৭০-৭২।

৭. আল-ফারক্ব বায়নাল ফিরাক, পৃ. ১২।

www.al-itisam.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে কোনো দলাদলি ছিল না

নবী ﷺ-এর মৃত্যুর পর মুসলিমদের ইমাম এবং রব্বুল আলামীনের রাসূল ﷺ-এর স্থলাভিষিক্ত কে হবেন, তা নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল। যাতে তাঁর হাতে সাধারণ বায়‘আত (আনুগত্যের শপথ) অনুষ্ঠিত হতে পারে, যা হবে শক্তিশালী ও প্রভাবশালী; যার মাধ্যমে ইসলামের বিধানসমূহ বাস্তবায়িত হবে এবং মুসলিমদের মর্যাদা ও জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সংরক্ষিত হবে। এই উদ্দেশ্যে আনছার ও মুহাজিরগণের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ‘সাক্বীফা বানী সা‘এদা’-তে (سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ) একত্রিত হয়েছিলেন। নবী ﷺ-এর পক্ষ থেকে স্পষ্ট দলীল ও নির্দেশনা থাকায় আবূ বকর رضي الله عنه-কে মুসলিমদের খলীফা হিসেবে মনোনীত করা হয়েছিল- যদিও হাশেমী বংশের কিছু সদস্য, আউস ও খাযরাজ গোত্রের কেউ কেউ এবং কিছু মুহাজিরদের পক্ষ থেকে শুরুতে কিছু কথা এসেছিল, কিন্তু দলীলের সামনে সেগুলো দ্রুতই বিলীন হয়ে গিয়েছিল এবং আহলুল হাল্লি ওয়াল আক্বদ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে সর্বসম্মতিক্রমে বায়‘আত সম্পন্ন হয়েছিল।

ছাহাবীগণের আদর্শই ছিল এমন, তাঁরা আল্লাহর বাণী এবং রাসূল ﷺ-এর বাণীর সামনে নিজেদের সঁপে দিতেন। ফলে সকলেই আবূ বকর رضي الله عنه-এর অনুগত হলেন, উম্মাহর ঐক্য সুদৃঢ় হলো, বিশৃঙ্খলা থেমে গেল এবং ঈমানের আলোতে অন্তরসমূহ প্রশান্ত হলো।

এভাবেই তাঁর খিলাফতকাল অতিবাহিত হয়েছিল; কেবল রিদ্দার যুদ্ধ ব্যতিরেকে, যেখানে আবূ বকর رضي الله عنه বিদ্রোহীদের দমন করেছিলেন। ফলে উম্মাহর ঐক্য পুনরায় ফিরে আসে এবং মানুষ দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে ফিরে আসতে শুরু করে। ইসলামের ইতিহাসে যখনই তাঁর নাম স্মরণ করা হয়, তখনই এটি একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে رضي الله عنه।

অতঃপর তিনি খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করেন উমার رضي الله عنه-এর ওপর। তাঁর জন্য পথ আগে থেকেই সুগম ছিল। ফলে তাঁর শাসনামলে ইসলাম যে অভাবনীয় মর্যাদা ও শক্তি প্রত্যক্ষ করেছিল, তা ছিল বিস্ময়কর।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

মুসলিম জামা‘আত থেকে বিভিন্ন দল বা ফেরকার বিচ্ছিন্ন হওয়া

পরিস্থিতি এভাবেই সুশৃঙ্খল ছিল, যতক্ষণ না ২৩ হিজরীতে আমীরুল মুমিনীন উমার رضي الله عنه-এর শাহাদাতের মাধ্যমে ফিতনার দ্বার উন্মোচিত হলো। তিনি জনৈক নিষ্ঠুর পাপাচারী অগ্নিপূজকের হাতে শহীদ হন, যার অন্তরে দ্বীনের প্রতি সামান্যতম মমতা ছিল না।

অতঃপর আল্লাহ মুসলিমদের প্রতি দয়া করলেন এবং পরবর্তী আমীরুল মুমিনীন হিসেবে খলীফায়ে রাশেদ উছমান رضي الله عنه-এর হাতে বায়‘আত সম্পন্ন হলো। তিনি তাঁর পূর্ববর্তী দুই সঙ্গী আবূ বকর ও উমার رضي الله عنهما-এর আদর্শ ও কর্মপন্থা অনুযায়ীই পরিচালিত হতে লাগলেন। কিন্তু সেই নিষ্ঠুর পাপাচারী অগ্নিপূজকের চক্রান্ত নির্মল জীবনযাত্রাকে কলুষিত করে তুলল এবং বিশৃঙ্খলা ও দাঙ্গাহাঙ্গামার দ্বার খুলে গেল। সেসব গোপন দাওয়াত সক্রিয় হয়ে উঠল, যারা প্রকাশ্যে ঐক্যের কথা বললেও অন্তরে কপটতা লালন করত। আর এই চক্রান্তের মূল হোতা ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা নামক সেই ইয়াহূদী, যে নিজেকে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দিত। আল্লাহর এই শত্রু উছমান ইবনে আফফান رضي الله عنه-এর বিরুদ্ধে আলী ইবনে আবূ তালেব رضي الله عنه-এর পক্ষ নেওয়ার ভান করে ফিতনা উস্কে দিতে সচেষ্ট হলো। অথচ প্রকৃতপক্ষে সে চেয়েছিল উম্মাহকে পূর্ববর্তী দুই খলীফার (আবূ বকর ও উমারের) বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলতে, এমনকি তাদের ইসলাম থেকেই বিচ্যুত করতে। এভাবেই সে (ইবনে সাবা) ফিতনার আগুন প্রজ্বলিত করতে থাকে, মানুষের কানে কানে বিভ্রান্তি ছড়াতে থাকে এবং তার অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকে। আল্লাহর এই শত্রু জমিনে ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টিতে লিপ্ত থাকে, যতক্ষণ না ৩৫ হিজরীতে আমীরুল মুমিনীন উছমান رضي الله عنه-এর শাহাদাতের মাধ্যমে তার সেই নিকৃষ্ট উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। উছমান رضي الله عنه অত্যন্ত ধৈর্যসহ আল্লাহর কাছে ছওয়াবের আশায় শহীদী মৃত্যুবরণ করেন। তবে খলীফায়ে রাশেদ আলী ইবনে আবূ তালেব رضي الله عنه-এর হাতে পূর্ণ বায়‘আত গ্রহণের মাধ্যমে সেই ফাটল কিছুটা প্রশমিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি (আলী ইবনে আবূ তালেব رضي الله عنه) উম্মাহর মাঝে দুটি উপদলে বিভক্ত হওয়ার মতো একটি দলীয় অনৈক্যের সম্মুখীন হন।

www.al-itisam.com

এভাবেই উম্মাহ এক সংঘাতের মাঝে পড়ে যায়, যাতে ছিফফীন ও জামালের যুদ্ধের চাকা ঘুরতে থাকে। আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু সেই উত্তপ্ত ও সংকটময় পরিস্থিতির মাঝে সময় অতিবাহিত করতে থাকেন, যতক্ষণ না ৪০ হিজরীর শুরুতে তিনি নির্যাতিত অবস্থায় শহীদ হন। অতঃপর হাসান ইবনে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু মুসলিমদের রক্তক্ষয় রোধ এবং উম্মাহর ঐক্য পুনরায় ফিরিয়ে আনার স্বার্থে খিলাফত ছেড়ে দিলে মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর হাতে বায়‘আত সম্পন্ন হয়।

এভাবেই খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগের সমাপ্তি ঘটে এবং মুসলিমদের সাধারণ শাসনভার বানী উমাইয়ার অধীনে চলে যায়।

অতঃপর বিভিন্ন দল, জামা‘আত এবং গোষ্ঠীগুলো ভিন্ন ধারায় নিজেদের আক্বীদাগত মতবাদ ছড়িয়ে দিতে শুরু করে, যা মূলত চারটি প্রধান উপাধির অধীনে বিকশিত হয়:

ক. ক্বাদারিয়্যাহ।
খ. শী‘আ।
গ. খাওয়ারিজ।
ঘ. মুরজিআহ।

পরবর্তীতে এগুলোও আবার অনেক শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং একই চিন্তাধারার মাঝেও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও সংঘাত চলতে থাকে। এই বিভক্তি ও মতপার্থক্য ছিল মূলত মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুঅতেরই এক জীবন্ত প্রমাণ। কারণ তিনি বলেছিলেন,

إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابَيْنِ افْتَرَقُوا فِي دِينِهِمْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً – يَعْنِي: الْأَهْوَاءَ –، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ، وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ، لَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ

‘নিশ্চয়ই দুই কিতাবধারীরা (ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টান) তাদের দ্বীনের ক্ষেত্রে ৭২ ফেরকায় বিভক্ত হয়েছে। আর নিশ্চয়ই এই উম্মত ৭৩টি দলে বিভক্ত হবে, অর্থাৎ প্রবৃত্তির অনুসারী দল—যাদের একটি ছাড়া বাকি সবাই জাহান্নামী। আর সেই (নাজাতপ্রাপ্ত) দলটি হলো জামা‘আত। অচিরেই আমার উম্মতের মাঝে এমন কিছু সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে, যাদের মাঝে ঐসব প্রবৃত্তি (ভ্রান্ত মতবাদ) এমনভাবে মিশে যাবে, যেমনটি জলাতঙ্ক রোগীর রক্তে ও রগে রগে বিষ মিশে যায়’ *(মুসনাদে আহমাদ, সুনানে আবু দাউদ ও হাকেম)*।

এই বিভক্তি বা দলগুলোর প্রতিটিই মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য একেকটি কাঁটাস্বরূপ, যা রাষ্ট্রের ভিত্তিকে দুর্বল করে, সংহতি বিনষ্ট করে এবং ঐক্যকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। যারা যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্ম, মতবাদ এবং ফেরকার ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেছেন, তারা দেখেছেন যে, এই অনৈক্য মূলত কিছু মৌলিক নীতি উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত। ইমাম শাতিবী রাহিমাহুল্লাহ ‘আল-ইতিছাম’ (১/১৭-১৮) গ্রন্থে বলেছেন,

‘ইসলামের প্রসার এবং এর সঠিক পথ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায়, তাঁর মৃত্যুর পর এবং ছাহাবীগণের যুগের অধিকাংশ সময় পর্যন্ত একদম সোজা ও অবিচল ছিল। অবশেষে তাদের মাঝে সুন্নাহ থেকে বিচ্যুত কিছু দলের উদ্ভব ঘটল এবং তারা পথভ্রষ্ট বিদ‘আতের দিকে ঝুঁকে পড়ল— যেমন ক্বাদারিয়্যাহ ও খারেজীদের বিদ‘আত। যাদের সম্পর্কে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে বলেছিলেন, يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ‘তারা ইসলামের অনুসারীদের হত্যা করবে এবং মূর্তিপূজারিদের ছেড়ে দেবে; তারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালি অতিক্রম করবে না’। অর্থাৎ তারা কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা-গবেষণা করবে না এবং সে অনুযায়ী আমলও করবে না।

এরপর সত্যবাদী নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘোষণা অনুযায়ী এই দলগুলোর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতেই থাকল। তিনি বলেছেন, افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ أَوْ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَالنَّصَارَى مِثْلَ ذَلِكَ، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ‘ইয়াহূদীরা ৭১ ফেরকায় এবং খ্রিষ্টানরা ৭২ ফেরকায় বিভক্ত হয়েছিল; আর আমার উম্মত ৭৩ ফেরকায় বিভক্ত হবে’। অন্য এক হাদীছে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ ‘তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতিনীতি বিঘত বিঘত এবং হাত হাত (পুরোপুরিভাবে) অনুসরণ করবে; এমনকি তারা যদি কোনো সাপের গর্তে প্রবেশ করে থাকে, তবুও তোমরা তাদের অনুকরণ করবে’। আমরা (ছাহাবীগণ) জিজ্ঞেস করলাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের কথা বোঝাচ্ছেন?’ তিনি বললেন, فَمَنْ ‘তবে আর কার কথা?’

দ্বিতীয় হাদীছটির বিষয়টি প্রথমটির চেয়ে অধিক ব্যাপক; কারণ প্রথম বিষয়টি কেবল প্রবৃত্তির অনুসারীদের একটি বিশেষ

www.al-itisam.com

অংশের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর দ্বিতীয় বিষয়টি সকল বিরোধিতার ক্ষেত্রে সাধারণ; যার প্রমাণ নবী ﷺ-এর বাণীর এই অংশ— ‘এমনকি তারা যদি কোনো সাপের গর্তে প্রবেশ করে থাকে, তবুও তোমরা তাদের অনুকরণ করবে’ *(বুখারী ও মুসলিম)*।

সত্যের বিরুদ্ধাচারী বা ভুল পথের অনুসারী প্রত্যেক ব্যক্তির স্বভাবই হলো অন্যদের সেদিকে আহ্বান জানানো। সে কেবল তাকে জিজ্ঞাসাকারীদেরই নয়, বরং অন্যদেরকেও এর প্রতি উৎসাহিত করে। কেননা কর্ম ও আদর্শের ক্ষেত্রে অন্যের অনুকরণ করা মানুষের মজ্জাগত বা সহজাত স্বভাব। আর এই অনুকরণপ্রবৃত্তির কারণেই বিরোধীদের মাঝে সৃষ্টি হয় বিভেদ এবং অনুসারীদের মাঝে তৈরি হয় সখ্যতা। আর এখান থেকেই ভিন্নমতাবলম্বীদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষের উৎপত্তি ঘটে।

ইসলাম তার প্রারম্ভে এবং সজীবতার যুগে ছিল প্রবল ও বিজয়ী। তার অনুসারীরা ছিল সংখ্যাগুরু এবং শ্রেষ্ঠ। প্রচুর অনুসারী ও সাহায্যকারী থাকায় তখন ইসলামে কোনো ‘একাকিত্ব বা অপরিচিত অবস্থা’ (الْغُرْبَة) ছিল না। ফলে যারা ইসলামের পথে চলত না, কিংবা যারা এ পথে চলত, কিন্তু বিদ‘আত করত, তাদের এমন কোনো প্রতাপ বা শক্তি ছিল না, যা আল্লাহর সফল দলকে দুর্বল করে দিতে পারে। তখন ইসলাম সঠিক পথে একতা ও শৃঙ্খলার সাথে চলছিল আর বিচ্যুতরা ছিল পরাজিত ও কোণঠাসা।

পরবর্তীতে ওয়াদা অনুযায়ী মুসলিমদের সেই ঐক্য অনৈক্যে রূপ নিতে শুরু করল এবং সম্ভাব্য দুর্বলতা দেখা দিল। ফলে বিচ্যুতদের প্রভাব বাড়তে লাগল এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকল। আর মানুষের স্বভাবজাত অনুকরণপ্রবৃত্তির কারণে তারা একে অন্যের সঙ্গে মিলে যেতে চাইল (যেহেতু অধিকাংশ মানুষ বিজয়ীরই অনুকরণ করে)। এভাবেই সুন্নাহর অনুসারীদের ওপর বিদ‘আত ও কুপ্রবৃত্তি জেঁকে বসল এবং অধিকাংশই বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ল। সৃষ্টিজগতে এটিই আল্লাহর নীতি যে, বাতিলপন্থিদের তুলনায় সত্যপন্থিরা সংখ্যায় অল্প হবে। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ ‘আপনি চাইলেও অধিকাংশ মানুষ ঈমান আনবে না’ *(ইউসুফ, ১২/১০৩)*। আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন, ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ ‘আর আমার বান্দাদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যকই কৃতজ্ঞ’ *(সাবা, ৩৪/১৩)*।

অচিরেই আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-এর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন আর তা হলো— ইসলাম পুনরায় ‘গুরবাহ’ বা অপরিচিত অবস্থায় ফিরে আসবে। আর এই ‘গুরবাহ’ বা অপরিচিত অবস্থা তখনই হবে, যখন হক্কের অনুসারীরা সংখ্যায় কমে যাবে অথবা তারা বিলীন হয়ে যাবে। আর সেই অবস্থা তখনই হবে, যখন ভালো কাজকে মন্দ এবং মন্দ কাজকে ভালো হিসেবে দেখা হবে। যখন সুন্নাহ পরিণত হবে বিদ‘আতে আর বিদ‘আত পরিণত হবে সুন্নায়। ফলে আহলুস সুন্নাহর ওপর তিরস্কার ও কঠোরতা আরোপ করা হবে; ঠিক যেমনটি শুরুতে (ইসলামের প্রাথমিক যুগে) বিদ‘আতীদের ওপর করা হতো। তবে আল্লাহ তাআলা ক্বিয়ামত পর্যন্ত গোমরাহি বা ভ্রষ্টতাকে একত্রিত হতে দেবেন না। তাই সকল ফেরকা —তাদের আধিক্য সত্ত্বেও— সুন্নাহর বিরোধিতার ওপর সাধারণত বা ঐতিহাসিকভাবে কখনো একমত হতে পারে না। বরং আল্লাহর নির্দেশ (ক্বিয়ামত) আসা পর্যন্ত অবশ্যই ‘আহলুস সুন্নাহ’র জামা‘আতটি সত্যের ওপর অটল থাকবে। তবে ভ্রান্ত ফেরকাগুলো তাদের সাথে প্রচুর বাদানুবাদ করবে এবং তাদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করবে— মূলত নিজেদের মতাদর্শের সাথে তাদের মিলিয়ে নেওয়ার জন্য। ফলে এই হক্কপন্থি দলটি দিবা-রাত্রি জিহাদ, বিতর্ক ও প্রতিরোধের মাঝেই অতিবাহিত করবে। আর একারণেই আল্লাহ তাদের জন্য প্রতিদান বহুগুণ বাড়িয়ে দিবেন এবং মহান ছওয়াব দান করবেন (ইমাম শাতিবী রহিমাহুল্লাহ-এর বক্তব্য সমাপ্ত)।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে এমন একটি সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা অপরিহার্য, যা বিভিন্ন দল-উপদল সম্পর্কে সেগুলোর সামগ্রিক রূপরেখা এবং সময়ক্রমিক সম্পর্কের বিষয়ে একটি ধারণা প্রদান করবে। কারণ এই সময়ক্রমের একটি বিপরীত তাৎপর্য রয়েছে। এই দলগুলোর আত্মপ্রকাশ হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষার্ধের আগে শুরু হয়নি। এর মাধ্যমেই ‘বিজয়ী দল’ (আত-তায়েফাতুল মানছূরাহ)-এর সেই গভীর ও অবিচ্ছিন্ন ধারার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যারা রিসালাতের উষালগ্ন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত তাদের আদর্শ থেকে এক মুহূর্তের জন্যও বিচ্ছিন্ন হয়নি। অতএব, এখন আমরা পঞ্চম অনুচ্ছেদের দিকে অগ্রসর হচ্ছি।

(ইনশা-আল্লাহ! চলবে)

www.al-itisam.com

কিতাবুল ইলম: জ্ঞান অর্জনের স্বরূপ

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(মিন্নাতুল বারী-১৪ তম পর্ব)

৩য় দলীল: সালাফদের মন্তব্য (মুনাওয়ালা ও মুকাতাবা প্রসঙ্গে): ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, وَرَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ذَلِكَ جَائِزًا 'আব্দুল্লাহ ইবনে উমার, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ ও মালেক ইবনে আনাস মুনাওয়ালাকে জায়েয মনে করতেন'।

১ম মন্তব্য: আব্দুল্লাহ ইবনে উমার: আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মন্তব্য বিশ্লেষণের শুরুতেই আমাদের তার পরিচয় নির্ধারণ করা জরুরী।

হাদীছ বর্ণনার সনদে 'আব্দুল্লাহ ইবনে উমার' নামে যে রাবীর উল্লেখ পাওয়া যায়, বিশেষ করে মুনাওয়ালা ও মুকাতাবা সংক্রান্ত রেওয়ায়াতে, তার পরিচয় নির্ধারণে মুহাদ্দিছগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

(ক) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার আল-উমরী: একদল মুহাদ্দিছ বলেন, এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছেন, عبد الله بن عمر العمري আব্দুল্লাহ ইবনে উমার আল-উমরী, যার পূর্ণ নাম আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ইবনে হাফছ আছিম ইবনে উমার ইবনে খাত্ত্বাব।

ইমাম কিরমানী ও ইমাম আয়নীর মতে, এই মতটিই সঠিক।

(খ) উবায়দুল্লাহ ইবনে উমার আল-উমরী: একদল মুহাদ্দিছের মতে, এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছেন, عبيد الله بن عمر العمري উবায়দুল্লাহ ইবনে উমার আল-উমরী, যিনি পূর্বোক্ত আব্দুল্লাহ ইবনে উমারের ভাই।

ইমাম রামাহুরমুযী রাহিমাহুল্লাহ তার المحدث الفاصل بين الراوي والواعي গ্রন্থে মুনাওয়ালা সংক্রান্ত রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন উবায়দুল্লাহ আল-উমরী থেকে।[৯]

তদ্রূপ ইমাম ইবনু আব্দিল বার্র রাহিমাহুল্লাহ তার গ্রন্থ جامع بيان العلم وفضله -এ মুনাওয়ালা প্রসঙ্গে বর্ণনা উল্লেখ করেছেন উবায়দুল্লাহ আল-উমরী সূত্রে।[১০]

ইমাম ইবনু মান্দা রাহিমাহুল্লাহ তার গ্রন্থ معرفة الصحابة-এ মুনাওয়ালা জায়েয সংক্রান্ত বর্ণনা 'আব্দুল্লাহ ইবনে উমার' নামে উল্লেখ করেছেন।

অনুরূপভাবে আবূ জুরআ আদ-দিমাশকী রাহিমাহুল্লাহ তার ইতিহাস বিষয়ক রচনাসমূহে (যেমন- تاريخ أبي زرعة الدمشقي) এই সংক্রান্ত রেওয়ায়েত عبد الله بن عمر হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[১১]

(গ) ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হওয়ার সম্ভাবনা: কেউ কেউ মনে করেন, এটি ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজেই। তবে ছাহাবী ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে এই ধরনের 'মুনাওয়ালা/মুকাতাবা' সংক্রান্ত বর্ণনা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত নয়।

ইমাম ইবনু শিহাব যুহরীর আমল: আব্দুল্লাহ ইবনে উমার আল-উমরী অথবা উবায়দুল্লাহ ইবনে উমার উমরী থেকে যে বর্ণনাটি প্রসিদ্ধ, সেটি মূলত ইবনু শিহাব যুহরীর আমল। লোকেরা ইমাম যুহরীর কাছে আসত এবং তার লেখা কিতাব শনাক্ত করত। তিনি স্বীকার করতেন, 'হ্যাঁ, এগুলো আমার কিতাব'। এরপর তিনি অনুমতি দিতেন, তোমরা এগুলো থেকে হাদীছ বর্ণনা করতে পার।

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয়: আগন্তুক ব্যক্তিরা ইমাম যুহরী থেকে হাদীছ সরাসরি শোনেননি। আবার সে নিজে সরাসরি পড়েছে আর ইমাম যুহরী শুনেছেন এমনও হয়নি। বরং কিতাব শনাক্ত ও মৌখিক অনুমতির ভিত্তিতে সে ইমাম যুহরী থেকে হাদীছ বর্ণনা করবে। আর এটিই মুনাওয়ালা।

আর এই মুনাওয়ালা সূত্রেই উবায়দুল্লাহ ইবনে উমার আল-উমরী ইমাম যুহরী থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

---

৮. ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বিএ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

৯. তাগলীকুত তা'লীক, ২/৭৩; আল-মুহাদ্দিছুল ফাসিল, পৃ. ৪৩৫।

১০. জামিউ বায়ানিল ইলম, ২/২১৮।

১১. তাগলীকুত তা'লীক, ২/৭৩।

www.al-itisam.com

২য় মন্তব্য: ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ:

كَتَبَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ إِلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ لَمَّا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى الْعِرَاقِ: التَقِطْ لِي مِائَةَ حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ حَتَّى أَرْوِيَهَا عَنْكَ عَنْهُ. قَالَ مَالِكٌ: فَكَتَبْتُهَا لَهُ ثُمَّ بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْهِ. فَقِيلَ لِمَالِكٍ: أَسَمِعَهَا مِنْكَ؟ قَالَ: هُوَ أَفْقَهُ مِنْ ذَلِكَ.

ইমাম ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-আনছারী রাহিমাহুল্লাহ যখন ইরাকের উদ্দেশ্যে রওনা দেন, তখন তিনি ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ-কে বলেন, আপনি আমার নিকট ইমাম যুহরীর ১০০টি হাদীছ লিখে পাঠাবেন, যাতে আমি সেগুলো আপনার মাধ্যমে ইমাম যুহরী থেকে বর্ণনা করতে পারি।[১২] তখন ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ ইমাম যুহরীর ১০০টি হাদীছ লিখে ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-আনছারীর নিকট ইরাকে পাঠান।

পরবর্তীতে ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ-কে জিজ্ঞেস করা হয়, এই ১০০টি হাদীছ কি ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-আনছারী সরাসরি আপনার থেকে শুনেছেন? তিনি উত্তরে বলেন, 'সে আমার চেয়েও বড় ফক্বীহ' অথবা 'সে আমার চেয়েও বেশি বুঝে'।

এই বক্তব্য থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-আনছারী ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ-এর নিকট থেকে উপরিউক্ত ১০০টি হাদীছ সরাসরি শ্রবণ করেননি, বরং ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ ইমাম যুহরীর সেই ১০০টি হাদীছ লিখিত আকারে তার নিকট প্রেরণ করেছিলেন। আর সেই লিখিত পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতেই ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-আনছারী হাদীছগুলো ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ-এর সনদে বর্ণনা করতেন।

এ কারণেই ছাত্ররা প্রশ্ন করেছিল, যেহেতু তিনি এই হাদীছগুলো সরাসরি আপনার থেকে শোনেননি, তাহলে কীভাবে তিনি আপনার সূত্রে সেগুলো বর্ণনা করতে পারেন? এর উত্তরে ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ-এর বক্তব্যের তাৎপর্য হলো ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-আনছারী এমন একজন জ্ঞানী ও ফক্বীহ, যিনি কেবল লিখিত হাদীছ পেলেই অন্ধভাবে তা বর্ণনা করবেন না; বরং সেখানে কোনো ভুল, অসঙ্গতি বা সমস্যা থাকলে তা অনুধাবন করার মতো গভীর জ্ঞান তার আছে। অর্থাৎ তিনি এতটাই পারদর্শী যে, লিখিত পাণ্ডুলিপি থেকে বর্ণনা করলেও তার জন্য যথেষ্ট, সরাসরি শ্রবণ অপরিহার্য নয়।

এ ঘটনা থেকে আরও একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে যাদের জ্ঞান পরিপক্ক নয়, তাদের জন্য সরাসরি মুহাদ্দিছের নিকট থেকে শ্রবণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর যারা লিখিত পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে বর্ণনা করতে চান, তাদের জন্য হাদীছশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান, পারদর্শিতা এবং যাচাই-বাছাই করার সক্ষমতা থাকা অপরিহার্য।

৩য় মন্তব্য: ইমাম মালেক:

سَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ أَصَحِّ السَّمَاعِ، فَقَالَ: قِرَاءَتُكَ عَلَى الْعَالِمِ – أَوْ قَالَ: الْمُحَدِّثِ – قِرَاءَةُ الْمُحَدِّثِ عَلَيْكَ، ثُمَّ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْكَ كِتَابَهُ.

একবার ইমাম মালেক ইবনে আনাস রাহিমাহুল্লাহ-কে ইসমাঈল ইবনু আবী উয়াইস জিজ্ঞেস করলেন, 'হাদীছ শ্রবণের সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি কোনটি?' তখন ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ বললেন, প্রথম ও সর্বোচ্চ স্তর হলো- قِرَاءَتُكَ عَلَى الْعَالِمِ 'তুমি আলেম (অথবা মুহাদ্দিছ)-এর সামনে বসে পড়ে শোনাবে'। অর্থাৎ ছাত্র কিতাব থেকে পড়বে, আর শায়খ শুনে সংশোধন করবেন। এটি ইমাম মালেকের নিকট হাদীছ গ্রহণের সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি। দ্বিতীয় স্তর হলো- قِرَاءَةُ الْمُحَدِّثِ عَلَيْكَ 'মুহাদ্দিছ তোমাকে পড়ে শোনাবেন, আর তুমি শুনবে'। এখানে শায়খ নিজে পাঠ করবেন, ছাত্র শুনে গ্রহণ করবে। এটি প্রথম স্তরের পরে স্থান পায়। আর তৃতীয় স্তর হলো- ثُمَّ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْكَ كِتَابَهُ 'তিনি তোমার কাছে তার কিতাব (পাণ্ডুলিপি) হস্তান্তর করবেন'। অর্থাৎ শায়খ তার লিখিত সংকলন ছাত্রের হাতে তুলে দেবেন এবং সেখান থেকে বর্ণনার অনুমতি দেবেন (مناولة مع الإذن)। এটি গ্রহণযোগ্য হলেও প্রথম দুই পদ্ধতির নিচে।[১৩]

উক্ত মন্তব্য প্রমাণ করে যে, ইমাম মালেকের নিকট মুনাওয়ালা ও মুকাতাবা গ্রহণযোগ্য।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সালাফদের অধিকাংশের নিকটেই মুনাওয়ালা ও মুকাতাবা গ্রহণযোগ্য।

(ইনশা-আল্লাহ! চলবে)

১২. ফাতহুল বারী, ১/১৫৫।

১৩. ফাতহুল বারী, ১/১৫৫।

www.al-itisam.com

প্রসঙ্গ: দণ্ডবিধি*

মূল: ড. আব্দুল আযীম আল-বাদাবী
অনুবাদ: হাফীযুর রহমান বিন দিলজার হোসাইন*

দণ্ডবিধির পরিচয়:

(الْحُدُوْدُ): হুদূদ (حُدُوْدُ) শব্দটি আরবী ‘হদ্দ’ (حَدُّ)-এর বহুবচন। আভিধানিক অর্থে ‘হদ্দ’ বলতে বোঝায়— দু’টি জিনিসের মাঝে প্রতিবন্ধক বা সীমারেখা হিসেবে থাকা কোনো বস্তু। ‘হদ্দ’ শব্দের অর্থ বাধা দেওয়া বা নিষেধ করা’।[১৬]

পারিভাষিক অর্থ: ‘হুদূদ’ বলতে বোঝায়— শরীআত কর্তৃক নির্ধারিত নির্দিষ্ট শাস্তিসমূহ, যা বিভিন্ন গোনাহ বা অপরাধের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যেন মানুষ পুনরায় অনুরূপ অপরাধে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকে’।[১৭]

দণ্ডবিধির অপরাধসমূহ:

কুরআন ও সুন্নাহ কিছু নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তি নিরূপণ করেছেন, এসব অপরাধকে বলা হয়, ‘দণ্ডবিধির অপরাধসমূহ’। এই অপরাধগুলো হলো, যেনা (ব্যভিচার), কাযফ (পবিত্র নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া), চুরি, মদ্যপান (নেশাগ্রস্ততা), হারাবা/ডাকাতি বা সশস্ত্র সন্ত্রাস, রিদ্দা (ইসলাম ত্যাগ) এবং বাগী (বিদ্রোহ বা রাষ্ট্রবিরোধী সশস্ত্র বিদ্রোহ)’।[১৮]

দণ্ডবিধি ক্বায়েম করার ফযীলত:

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, حَدٌّ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ‘কোনো জনপদে একটি হদ্দ কার্যকর করা সেই জনপদে ৪০ দিন বৃষ্টিপাত হওয়ার তুলনায় উত্তম’।[১৯]

আত্মীয়-অনাত্মীয় এবং সম্মানিত ব্যক্তি ও সাধারণ মানুষ সকলের ক্ষেত্রেই দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করা বাধ্যতামূলক:

উবাদা ইবনুছ ছামেত রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, رَسُولُ اللهِ ﷺ أَقِيمُوا حُدُودَ اللهِ فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ وَلَا تَأْخُذْكُمْ فِي اللهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ ‘তোমরা কাছের ও দূরের সকলের উপর আল্লাহ নির্ধারিত দণ্ডবিধি (হদ্দ) কার্যকর করো। আল্লাহর কাজে কোন সমালোচকের সমালোচনা যেন তোমাদেরকে বিব্রত না করে’।[২০] আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ أُسَامَةَ كَلَّمَ النَّبِيَّ ﷺ فِي امْرَأَةٍ فَقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ فَعَلَتْ ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ‘উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহু এক মহিলার ব্যাপারে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সুপারিশ করলেন। তখন তিনি বললেন, তোমাদের পূর্বেকার বিভিন্ন সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে গেছে। কারণ তারা নিম্নশ্রেণির লোকদের উপর শরীআতের শাস্তি ক্বায়েম করত। আর সম্মানিত লোকদের অব্যাহতি দিত। ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! ফাতেমাও যদি এমন কাজ করত, তাহলে অবশ্যই আমি তার হাত কেটে দিতাম’।[২১]

দণ্ডবিধি (শরীআত নির্ধারিত শাস্তি) যদি শাসকের নিকট উপস্থাপিত হয়ে যায়, তবে তাতে সুপারিশ করা যাবে না:

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّتْهُمُ الْمَرْأَةُ الْمَخْزُومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَكَلَّمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا ضَلَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ﷺ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا ‘মাখযূম গোত্রের এক মহিলার ব্যাপারে কুরাইশ বংশের লোকদের খুব দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল, যে চুরি করেছিল। ছাহাবীগণ বললেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে কে

---

১৪. শায়খ আব্দুল আযীম বাদাবী প্রণীত ‘আল-ওয়াজীয ফী ফিক্বহিস সুন্নাতি ওয়াল কিতাবিল আযীয’ বই থেকে সংগৃহীত।

১৫. প্রিন্সিপ্যাল, দারুস সালাম ইসলামী কমপ্লেক্স, পিরুজালী ময়তাপাড়া, গাজীপুর।

১৬. ফিক্বহুস সুন্নাহ, ২/৩০২।

১৭. মানারুস সাবীল, ২/৩৬০।

১৮. ফিক্বহুস সুন্নাহ, ২/৩০২।

১৯. ইবনু মাজাহ, হা/২৫৩৮, ‘শব্দ বিন্যাস তাঁরই’; নাসাঈ, হা/৪৯০৪, আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে হাসান বলেছেন।

২০. ইবনু মাজাহ, হা/২৫৪০; মিশকাত, হা/৩৫৮৭, আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে হাসান বলেছেন।

২১. ইরওয়াউল গালীল, হা/২৩১৯, আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন; ছহীহ বুখারী, হা/৬৭৮৭।

সমাজের কাঠামোকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার একটি অন্যতম বিষয় হচ্ছে ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা। বিচারের ক্ষেত্রে কোনো সমাজে বৈষম্য করা হলে সে সমাজের ধ্বংস অনিবার্য। -অনুবাদক

www.al-itisam.com

কথা বলতে পারবে? আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয়জন উসামা ইবনু যায়েদ রাযিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া এটা কেউ করতে পারবে না। তখন উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে কথা বললেন, এতে তিনি বললেন, তুমি আল্লাহর শাস্তির বিধানের ব্যাপারে সুপারিশ করছ? এরপর তিনি দাঁড়িয়ে খুৎবা দিলেন এবং বললেন, হে মানবমণ্ডলী! নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্বের লোকেরা গোমরাহ হয়ে গিয়েছে। কারণ, কোনো সম্মানী ব্যক্তি যখন চুরি করত, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন কোনো দুর্বল লোক চুরি করত, তখন তার উপর শরীআতের শাস্তি ক্বায়েম করত। আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ ﷺ-এর কন্যা ফাতেমাও যদি চুরি করে, তবে অবশ্যই মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর হাত কেটে দিবেন'।[২২]

মুমিনের দোষত্রুটি গোপন রাখা মুস্তাহাব:

ছাফওয়ান ইবনু উমাইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَيَّ خَمِيصَةٌ لِي ثَمُنُ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلَسَهَا مِنِّي فَأُخِذَ الرَّجُلُ فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهِ لِيُقْطَعَ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَتَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا أَنَا أَبِيعُهُ وَأُنْسِئُهُ ثَمَنَهَا؟ قَالَ فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ 'একদা আমি ৩০ দিরহাম মূল্যের আমার একটি চাদরে মসজিদে ঘুমিয়ে ছিলাম। অতঃপর এক ব্যক্তি এসে আমার নিকট থেকে সেটা টেনে নিয়ে যায়। তাকে হাতেনাতে ধরে নবী ﷺ-এর নিকট আসা হলে তিনি তার হাত কাটার আদেশ দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, মাত্র ৩০টি দিরহামের কারণে আপনি তার হাত কাটবেন? আমি তার নিকট এটা বাকীতে বিক্রয় করছি। তিনি বললেন, তুমি তাকে আমার নিকট নিয়ে আসার পূর্বে তা করলে না কেন?'[২৩]

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ 'যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ গোপন রাখবে'।[২৪]

আর এটাও মুস্তাহাব যে, বান্দা নিজেই নিজের দোষত্রুটি গোপন রাখবে। নবী ﷺ-এর বাণী, كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ 'আমার সকল উম্মতকে মাফ করা হবে, তবে (দোষ) প্রকাশকারী ব্যতীত। আর নিশ্চয় এটা বড়ই অন্যায় যে, কোনো ব্যক্তি রাতের বেলা অপরাধ করল, যা আল্লাহ গোপন রাখলেন। কিন্তু সে সকাল হলে বলে বেড়াতে লাগল, হে অমুক! আমি আজ রাতে এই এই কাজ করেছি। অথচ সে এমন অবস্থায় রাত কাটাল যে, আল্লাহ তার কর্ম লুকিয়ে রেখেছিলেন, আর সে ভোরে উঠে তার উপর আল্লাহর দেওয়া আবরণ খুলে ফেলল'।[২৫]

হুদুদ (শরীআত নির্ধারিত দণ্ডসমূহ) ক্বায়েম করা হলে উক্ত পাপ কাজ মাফ হয়ে যায়:

উবাদা ইবনু ছামেত রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْآيَةَ فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فَهُوَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ 'আমরা এক মজলিসে নবী ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম। তখন তিনি বলেন, তোমরা এই কথার উপর আমার নিকট বায়আত কর যে, তোমরা আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে শরীক করবে না, ব্যভিচার করবে না, চুরি করবে না, এরপর তিনি পূর্ণ আয়াত পড়ে শোনান। পরে তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাঁর বায়আত পূর্ণ করবে, তার বিনিময় আল্লাহ তাআলার নিকট রয়েছে, আর যে ব্যক্তি ঐ সকলের মধ্যে কোনো একটা করবে, তারপর যদি আল্লাহ তার এই কাজকে গোপন রাখেন, তবে তা আল্লাহর উপর নির্ভর করে, তিনি ইচ্ছা করলে শাস্তি দিবেন, আর ইচ্ছা করলে ক্ষমা করবেন'।[২৬]

হদ্দ (দণ্ডবিধি) কে কার্যকর করবে?[২৭]

সরকার প্রধান অথবা তাঁর প্রতিনিধিই কেবল তা হদ্দ (দণ্ডবিধি) কার্যকর করবে। কারণ, তিনি ﷺ নিজ জীবদ্দশায় হদ্দ (দণ্ডবিধি) কার্যকর করতেন এবং তাঁর পরে তাঁর খলীফাগণ তদ্রূপ হদ্দ (দণ্ডবিধি) কার্যকর করেছেন। আর তিনি ﷺ হদ্দ (দণ্ডবিধি) কার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন এবং বলেছিলেন, وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا 'হে উনাইস! তুমি সকালে এ লোকটির স্ত্রীর নিকট যাও; যদি সে স্বীকার করে, তবে তাকে রজম কর'।[২৮]

---

২২. ছহীহ বুখারী, হা/৬৭৮৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৮৮; আবূ দাউদ, হা/৪৩৭৩; নাসাঈ, হা/৪৮৯৯, ৪৯০২; তিরমিযী, হা/১৪৩০; ইবনু মাজাহ, হা/২৫৪৭।

২৩. আবূ দাউদ, হা/৪৩৯৪; নাসাঈ, হা/৪৯০২; ইবনু মাজাহ, হা/২৫৯৫।

২৪. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৯৯; তিরমিযী, হা/১৪২৫; ইবনু মাজাহ, হা/২৫৪৪; আবূ দাউদ, হা/৪৯৪৬।

২৫. ছহীহ বুখারী, হা/৬০৬৯; ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৯০; মিশকাত, হা/৪৮৩০।

২৬. ছহীহ বুখারী, হা/১৮; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭০৯; নাসাঈ, হা/৪২১০, 'শব্দ বিন্যাস তাঁরই'।

২৭. মানারুস সাবীল, ২/৩৬১।

২৮. মানারুস সাবীল, ২/৩৬১।

www.al-itisam.com

কুরবানীর পর পরিচ্ছন্নতা: সচেতনতা ও ইসলামী দিকনির্দেশনা

-মো. আকরাম হোসেন*

ঈদুল আযহা মুসলিম উম্মাহর জন্য ত্যাগ ও আনুগত্যের এক মহিমান্বিত দৃষ্টান্ত। ১০ যিলহজ্জে উদযাপিত এই ঈদে সামর্থ্যবান মুসলিমরা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পশু কুরবানী করেন। আমাদের দেশে এ উৎসব ব্যাপক পরিসরে পালিত হয়—শহর, বন্দর ও গ্রাম সবখানেই কুরবানীর দৃশ্য চোখে পড়ে। তবে এ ইবাদতের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, আর তা হলো কুরবানীর পর বর্জ্য যথাযথভাবে অপসারণ ও পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা।

বাস্তবে দেখা যায়, কুরবানীর দিন ও পরবর্তী সময়ে বিপুল পরিমাণ বর্জ্য— রক্ত, নাড়িভুঁড়ি, হাড়, খুর, শিং ইত্যাদি যথাযথ ব্যবস্থাপনার অভাবে যেখানে-সেখানে পড়ে থাকে। এতে অল্প সময়ের মধ্যেই দুর্গন্ধ ছড়ায়, নালা-নর্দমা বন্ধ হয়ে যায়, এমনকি বিভিন্ন রোগবালাইয়ের আশঙ্কাও তৈরি হয়। বিশেষ করে ঘনবসতিপূর্ণ শহরাঞ্চলে এর প্রভাব আরও বেশি দৃশ্যমান হয়।

অথচ ইসলাম পরিচ্ছন্নতাকে শুধু বাহ্যিক শোভা হিসেবে দেখেনি; বরং একে ঈমানের অংশ হিসেবে বিবেচনা করেছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন’ *(আল-বাক্বারা, ২/২২২)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ ‘আর আপনার পোশাককে পবিত্র রাখুন’ *(আল-মুদ্দাছছির, ৭৪/৪)*।

এই নির্দেশনা কেবল ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং সামগ্রিক জীবনাচরণে পবিত্রতা বজায় রাখা ও পরিপাটি থাকার আহ্বান বহন করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেন, الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ ‘পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক’।[৩০] আরেক হাদীছে এসেছে, إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর, আর তিনি সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন’।[৩১]

সুতরাং কুরবানীর মতো একটি ইবাদতের পর যদি আমরা পরিবেশ নোংরা করে ফেলি, তাহলে তা ইসলামের মূল চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না।

কুরবানীর বর্জ্য সঠিকভাবে অপসারণ না করলে তা শুধু দুর্গন্ধই সৃষ্টি করে না; বরং মশা-মাছির উপদ্রব বাড়িয়ে দেয় এবং ডায়রিয়া, জন্ডিসসহ নানা রোগের ঝুঁকি তৈরি করে। ইসলামের একটি মৌলিক নীতি এ ক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক করে দেয়, لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ‘ক্ষতি করা যাবে না এবং ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াও যাবে না’।[৩২]

এই নীতির আলোকে স্পষ্ট, এমন কোনো কাজ করা উচিত নয়, যা অন্যের কষ্ট বা ক্ষতির কারণ হয়। কাজেই কুরবানীর বর্জ্য অবহেলায় ফেলে রেখে প্রতিবেশী বা সমাজের মানুষের ভোগান্তি সৃষ্টি করা ইসলামী আদর্শের পরিপন্থি।

কুরবানীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কিছু সহজ কিন্তু কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। গ্রামাঞ্চলে যাদের সুযোগ আছে, তারা আগে থেকেই একটি নির্দিষ্ট স্থানে গর্ত করে রাখতে পারেন। কুরবানীর পর পশুর বর্জ্য সেখানে মাটিচাপা দিলে তা পরিবেশ দূষণ রোধের পাশাপাশি পরে জৈব সারে পরিণত হয়ে কৃষিকাজে ব্যবহৃত হতে পারে।

শহরাঞ্চলে এ সুযোগ না থাকলে বর্জ্য আলাদা করে ব্যাগ বা বস্তায় ভরে নির্দিষ্ট ডাস্টবিন বা কন্টেইনারে রাখতে হবে। এতে সিটি কর্পোরেশনের কর্মীরা সহজেই বর্জ্য অপসারণ করতে পারবেন। রাস্তার পাশে বা নর্দমায় বর্জ্য ফেলে দেওয়া কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

এছাড়া, একই মহল্লা বা ভবনের কয়েকটি পরিবার মিলে নির্দিষ্ট স্থানে কুরবানী করলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অনেক সহজ হয়। এতে নির্দিষ্ট স্থান থেকে দ্রুত বর্জ্য সরানো সম্ভব হয় এবং আশপাশের পরিবেশও তুলনামূলকভাবে পরিচ্ছন্ন থাকে।

কুরবানীর কাজ শেষে রক্তমাখা স্থান দ্রুত পরিষ্কার করা জরুরী। পানি দিয়ে ধোয়ার পাশাপাশি জীবাণুনাশক ব্যবহার করলে দুর্গন্ধ ও জীবাণুর বিস্তার কমে। হাদীছে এসেছে, إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ ‘রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া ছাদাক্বা’।[৩৩]

বাকি অংশ ২৭ নং পেজে...

২৯. প্রভাষক (আরবী), পাঁচটিকরী আলিম মাদরাসা, ভোলাহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
৩০. ছহীহ মুসলিম, হা/২২৩; মিশকাত, হা/২৮১।
৩১. ছহীহ মুসলিম, হা/৯১।
৩২. ইবনে মাজাহ, হা/২৩৪০, হাদীছ ছহীহ।
৩৩. সিলসিলা ছহীহা, হা/৫৭৬, ২/৭৫; আদাবুল মুফরাদ, হা/৪২২।

www.al-itisam.com

মুহাররম ও আশূরা: গুরুত্ব, করণীয় ও বর্জনীয়

-আবূ মাহদী মামুন বিন আব্দুল্লাহ*

ভূমিকা:

হিজরী বর্ষের প্রথম মাস মুহাররম। এটি একটি পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ মাস, যার শুরুতেই মুসলিমদের মনে জাগে নতুন ভাবনা, আত্মশুদ্ধির ডাক ও আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির অনুপ্রেরণা। এই মাস আল্লাহ তাআলার নিকট বিশেষভাবে সম্মানিত, যাকে ‘আশহুরে হুরুম’ তথা সম্মানিত চার মাসের অন্যতম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। মুহাররম মাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিন ‘আশূরা’, যা বহু ঐতিহাসিক ও নবীগণ আলাইহিস্ সালাম-এর সঙ্গে জড়িত ঘটনার স্মৃতিবাহী। আল্লাহর পক্ষ থেকে এই দিনে বিভিন্ন নবী আলাইহিস্ সালাম কে মুক্তি ও সাহায্য দান করা হয়েছে। তাছাড়া এই দিনে ছিয়াম রাখতে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে উৎসাহিত করেছেন এবং এর ফযীলত সম্পর্কে বিশেষভাবে বলেছেন। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে মুহাররম, আশূরার পরিচয়, নামকরণ, গুরুত্ব ও আত্মশুদ্ধির তাৎপর্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

মুহাররম মাসের পরিচয়:

মুহাররম (محرم) শব্দটি আরবী, যা حرم শব্দমূল থেকে এসেছে। এর অর্থ হলো পবিত্র, সম্মানিত। এই মুহাররম হিজরী বর্ষের প্রথম মাস। চারটি আশহুরে হুরুম বা সম্মানিত মাসসমূহের অন্যতম মুহাররম মাস। এটি এমন একটি মাস, যে মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। মুসলিমদের জন্য এটি বিশেষভাবে মর্যাদাপূর্ণ।

মুহাররম নামে নামকরণ:

চারটি আশহুরে হুরুম বা সম্মানিত মাসের একটি মুহাররম মাস। এই মাসগুলোতে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ থাকলেও আরবরা তা মানত না। তারা কৌশলের আশ্রয় নিত। তারা মুহাররম মাসকে ‘সফরুল আউয়াল’ বা প্রথম সফর নাম দিয়ে তাদের ইচ্ছামতো যুদ্ধের সময় আগ-পিছ করত। তাই আল্লাহ তাআলা তাদের এই যাবতীয় কর্মকাণ্ড বাতিল করে এই মাসের নামকরণ করলেন মুহাররম নামে। তাই তো এই মাসকে ‘শাহরুল্লাহিল মুহাররম’ বলা হয়।

মুহাররম মাসের গুরুত্ব ও ফযীলত:

(১) মুহাররম একটি হারাম বা সম্মানিত মাস: হিজরী বর্ষের প্রথম মাস মুহাররম। হাদীছের ভাষায় شهر الله المحرم বা আল্লাহর সম্মানিত মাস। আল্লাহ তাআলা বছরের যে কয়টি মাসকে বিশেষ মর্যাদায় মহিমান্বিত করেছেন, মুহাররম তার অন্যতম। কুরআনে কারীমে আল্লাহ বলেন, ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ ‘নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহর বিধানে আল্লাহর কাছে গণনায় মাসের সংখ্যা ১২টি। তার মধ্যে চারটি হলো সম্মানিত মাস’ *(আত-তাওবা, ৯/৩৬)*। আর সম্মানিত চারটি মাস হচ্ছে মুহাররম, রজব, যিলক্বদ ও যিলহজ্জ।[৩৬]

(২) রামাযানের ছিয়ামের পর সর্বোত্তম মুহাররম মাসের ছিয়াম: রামাযান মাসের ছিয়াম ফরয, আর মুহাররম মাসের ছিয়াম নফল। মুহাররমের ছিয়ামের মর্যাদা আল্লাহর কাছে এতই বেশি যে, রামাযানের ছিয়ামের পরেই সর্বোত্তম এই মাসের ছিয়াম। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ المُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ ‘রামাযানের ছিয়ামের পর সর্বোত্তম ছিয়াম হচ্ছে আল্লাহর মাস মুহাররমের ছিয়াম। আর ফরয ছালাতের পর সর্বোত্তম ছালাত হচ্ছে রাতের ছালাত’।[৩৭]

(৩) আশূরায়ে মুহাররমের ছিয়ামের বিনিময়ে পূর্বের এক বছরের গুনাহ মাফ হয়: মুহাররম মাসের ১০ তারিখের মূল ইবাদত হচ্ছে ছিয়াম পালন করা। আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দিনে নিজে ছিয়াম রেখেছেন এবং ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লা-হু আনহুম কেও উৎসাহ দিয়েছেন। এ দিনের ছিয়ামের বিনিময়ে আল্লাহর কাছে পূর্বের এক বছরের গুনাহ মাফ হওয়ার আশাও ব্যক্ত করেছেন। আবূ ক্বাতাদাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ ‘আশূরার দিনের ছিয়ামের ব্যাপারে আমি আল্লাহর নিকট আশা রাখি, তিনি পূর্বের এক বছরের গুনাহ মাফ করে দেবেন।[৩৮]

(৪) মুহাররম মাসের ছিয়ামের প্রতি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশেষ গুরুত্ব: রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রামাযানের পর আশূরার ছিয়ামের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন, যা এই মাসের গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রমাণ করে। আশূরার ছিয়াম অতীতে নবীগণ আলাইহিস্ সালাম-এর সময়েও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَهَذَا الشَّهْرَ، يَعْنِي شَهْرَ

৩৫. অধ্যয়নরত, আক্বীদা ও দাওয়াহ বিভাগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

৩৬. ছহীহ বুখারী, হা/৪৬৬২।

৩৭. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬৩; আবূ দাঊদ, হা/২৪২৯; তিরমিযী, হা/৪৩৮।

৩৮. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬২।

www.al-itisam.com

رَمَضَانَ 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আশূরার দিনের চেয়ে গুরুত্ব দিয়ে অন্য কোনো দিন ছিয়াম রাখতে দেখিনি এবং রামাযান মাস অপেক্ষা অন্য কোনো মাসে এত গুরুত্ব দিয়ে ছিয়াম রাখতে দেখিনি'।[৩৯]

আশূরা কী?

আশূরা শব্দটির বিশ্লেষণ নিয়ে ভাষাবিদগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। অধিকাংশের নিকট মুহাররম মাসের দশম তারিখই আশূরার দিন। এটা আরবী শব্দ আশারা (عشر) হতে নির্গত, যার অর্থ দশ। অতএব, মুহাররম মাসের দশম তারিখে ছিয়াম রাখার নামই হলো আশূরার ছিয়াম।[৪০]

আশূরার ছিয়াম গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণ:

মুহাররমের ১০ তারিখ বা আশূরায়ে মুহাররমে আল্লাহর হুকুমে মিশরের অত্যাচারী বাদশাহ ফেরাউন তার সৈন্যসহ সমুদ্রে ডুবে মরেছিল এবং মূসা আলাইহিস সালাম ও তার সাথী বনূ ইসরাঈল ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। তাই আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে মূসা আলাইহিস সালাম এ দিন ছিয়াম রেখেছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ، فَوَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقِيلَ لَهُمْ: مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُومُونَهُ؟ فَقَالُوا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ، أَنْجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ، وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا، فَنَحْنُ نَصُومُهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

'যখন নবী ﷺ মদীনায় এলেন, তখন দেখলেন যে, ইয়াহূদীরা আশূরার দিন ছিয়াম রাখছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কোন দিনের ছিয়াম?' তারা বলল, এটি সেই মহান দিন, যেদিন আল্লাহ তাআলা মূসা আলাইহিস সালাম ও তার ক্বওমকে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং ফেরাউন ও তার সৈন্যদের ধ্বংস করেছিলেন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ মূসা আলাইহিস সালাম এদিন ছিয়াম রেখেছিলেন, তাই আমরাও রাখি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমরা তোমাদের তুলনায় মূসা আলাইহিস সালাম-এর অনুসরণের অধিক নিকটবর্তী'। অতঃপর তিনি নিজে আশূরার ছিয়াম রাখলেন এবং ছাহাবীদেরও রাখতে নির্দেশ দিলেন'।[৪১] সে কারণে এদিন নাজাতে মূসা আলাইহিস সালাম-এর শুকরিয়ার নিয়্যতে ছিয়াম রাখা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ। এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও ছাহাবায়ে কেরাম নিয়মিতভাবে পালন করতেন। তাই এই দিনের ছিয়ামের গুরুত্ব অপরিসীম।

৩৯. ছহীহ বুখারী, হা/২০০৬; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৩২।
৪০. মিরআতুল মাফাতীহ, ৭/৪৫।
৪১. ছহীহ বুখারী, হা/২০০৪; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৩০, ১১৩২।

আশূরার ছিয়ামের হুকুম:

ইসলামের পূর্বযুগ হতেই এ ছিয়ামের প্রচলন ছিল। অতঃপর নবী ﷺ-এর মাধ্যমে তা উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্য ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়। রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার পর এটা সকলের ঐকমত্যে সুন্নাত। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

'কুরাইশরা জাহেলী যুগে আশূরার দিন ছিয়াম রাখত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও এদিন ছিয়াম রাখতেন। যখন তিনি মদীনায় আসলেন, তখন তিনি ছিয়াম পালন করলেন এবং ছাহাবীদেরও এটি পালনের আদেশ দিলেন। কিন্তু যখন রামাযানের ছিয়াম ফরয করা হলো, তখন তিনি আশূরার ছিয়াম পরিত্যাগ করলেন। এরপর যার ইচ্ছা সে ছিয়াম রাখত, আর যার ইচ্ছা তা ছেড়ে দিত'।[৪২]

আশূরার ইতিহাস:

আল্লাহ কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের অন্যতম হলো ফেরাউনের জাতি। আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াতের জন্য মূসা আলাইহিস সালাম ও তার ভাই হারূন আলাইহিস সালাম-কে নবী হিসেবে প্রেরণ করেন। আর আসমানী কিতাব তাওরাত নাযিল করেন। মূসা আলাইহিস সালাম-এর জন্মের পূর্ব থেকেই বনূ ইসরাঈলের উপর ফেরাউন অত্যাচার করত। ফেরাউন নিজেকে রব দাবি করল এবং মূসা আলাইহিস সালাম-এর ক্বওমের উপর অত্যাচার আরো বৃদ্ধি করে দিল। ফলে মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর আদেশে একরাতে তার অনুসারীদের নিয়ে চলে যাওয়ার সময় সমুদ্র বাধা হয়ে দাঁড়াল। আল্লাহ মূসা আলাইহিস সালাম-কে লাঠি দ্বারা সাগরে আঘাত করার আদেশ দিলে সাগর ভাগ হলো এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতের মতো হয়ে গেল' *(দ্র. আশ-শূআরা, ২৬/৫২)*। সাগর পাড়ি দেওয়ার সময় ফেরাউন তাদের পিছনে ধাওয়া করল। আল্লাহ মূসা আলাইহিস সালাম ও তার জাতিকে আল্লাহ রক্ষা করলেন আর ফেরাউন ও তার জাতিকে পানিতে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করলেন *(দ্র. আল-বাকারা, ২/৫০)*। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾

'আর আমরা বনূ ইসরাঈলকে সাগর পার করে দিলাম। তারপর তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল ফেরাউন এবং তার সেনাবাহিনী হঠকারিতা ও বাড়াবাড়ি বশে। অতঃপর যখন সে ডুবতে লাগল,

৪২. ছহীহ বুখারী, হা/২০০২; ছহীহ মুসলিম, হা/১১২৫।

www.al-itisam.com

তখন বলে উঠল, আমি ঈমান আনলাম এই মর্মে যে, কোনো উপাস্য নেই তিনি ব্যতীত যার উপরে বনূ ইসরাঈল ঈমান এনেছে। আর আমি তার প্রতি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (আল্লাহ বললেন,) এখন? অথচ ইতিপূর্বে তুমি অবাধ্যতা করেছিলে এবং ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে' (ইউনুস, ১০/৯০-৯১)।

এই মহান দিনটি ছিল মুহাররম মাসের ১০ তারিখ তথা আশূরার দিন। ইয়াহূদীরা এই দিনকে সম্মান করত ও গুরুত্ব দিত। আবূ মূসা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَعُدُّهُ الْيَهُودُ عِيدًا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَصُومُوهُ أَنْتُمْ 'আশূরার দিনকে ইয়াহূদীগণ ঈদ মনে করত। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবীগণ রাযিয়াল্লা-হু আনহুম কে বললেন, 'তোমরাও এ দিনের ছিয়াম পালন করো'।[৪৩]

আশূরায়ে মুহাররমে করণীয়:

(১) হারাম মাস হিসাবে এ মাসকে সম্মান করা: মুহাররম চারটি পবিত্র মাসের একটি। এ মাসে গুনাহ ও ঝগড়া-বিবাদ থেকে দূরে থাকা উচিত। ছাহাবীরা রাযিয়াল্লা-হু আনহুম এ মাসকে যথাযথ সম্মান করতেন। আবূ জামরাহ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা-এর সাথে বসতাম। তিনি আমাকে তার আসনে বসাতেন। একবার তিনি বললেন, তুমি আমার কাছ থেকে যাও, আমি তোমাকে আমার ধনসম্পদ হতে কিছু অংশ প্রদান করব। আমি তার সাথে দুই মাস থাকলাম। অতঃপর একদা তিনি বললেন, আব্দুল কায়েস গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আগমন করলে তিনি বললেন, 'তোমরা কোন গোত্রের?' কিংবা বললেন, 'কোন প্রতিনিধি দলের?' তারা বললেন, রবী'আ গোত্রের। তিনি বললেন, 'স্বাগত সে গোত্র বা সে প্রতিনিধি দলের প্রতি, যারা অপদস্থ ও লজ্জিত না হয়েই আগমন করেছে'। তারা বললেন,

يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلاَّ فِي شَهْرِ الحَرَامِ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ، نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا، وَنَدْخُلْ بِهِ الجَنَّةَ.

'হে আল্লাহর রাসূল! হারাম মাস ব্যতীত অন্য কোনো সময় আমরা আপনার নিকট আগমন করতে পারি না। আমাদের ও আপনার মধ্যে মুযার গোত্রীয় কাফেরদের বসবাস। তাই আমাদের কিছু স্পষ্ট নির্দেশ দিন, যাতে করে আমরা যাদের পিছনে ছেড়ে এসেছি তাদের অবগত করতে পারি এবং যাতে করে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি'।[৪৪]

(২) আশূরার দিনে ছিয়াম রাখা: এ মাসের ১০ তারিখে ছিয়াম পালন করা একটি মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাতে অবস্থান কালে এ ছিয়াম পালন করতেন। মক্কার কুরাইশরাও এই দিনকে সম্মান করত ও ছিয়াম পালন করত। আশূরা অর্থাৎ মুহাররমের ১০ তারিখে ছিয়াম রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُهُ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

'জাহেলী যুগে কুরাইশরা আশূরার ছিয়াম পালন করত এবং রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও এ ছিয়াম পালন করতেন। যখন তিনি মদীনায় আগমন করেন, তখনও এ ছিয়াম পালন করেন এবং তা পালনের নির্দেশ দেন। যখন রামাযানের ছিয়াম ফরয হলো, তখন আশূরার ছিয়াম ছেড়ে দেওয়া হলো। যার ইচ্ছা সে পালন করবে, আর যার ইচ্ছা পালন করবে না'।[৪৫]

মদীনায় হিজরতের পর তিনি এ ছিয়াম পালন করতেন এবং ছাহাবায়ে কেরামকেও ছিয়াম পালনের নির্দেশ দেন। রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার আগে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাররম মাসের ১০ তারিখে ছিয়াম পালনে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। ছাহাবীগণও আশূরার ছিয়াম পালনের ব্যাপারে গুরুত্ব দিতেন।

আশূরার ছিয়াম কতদিন?

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় ও মদীনায় প্রথম দিকে মুহাররম মাসে একদিন ছিয়াম পালন করতেন। পরবর্তীতে ইয়াহূদীদের বিরোধিতা করার জন্য ৯ তারিখসহ দুই দিন ছিয়াম পালনের আশা ব্যক্ত করেন। যেমন ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিজে আশূরার দিন ছিয়াম রাখলেন এবং আমাদেরকেও এ ছিয়াম পালনের নির্দেশ দেন, তখন লোকেরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানরা এ দিনটিকে সম্মান করে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ صُمْنَا يَوْمَ التَّاسِعِ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ 'আগামী বছর আসলে আমরা নবম দিনেও ছিয়াম পালন করব'। কিন্তু আগামী বছর না আসতেই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুবরণ করেন।[৪৬] অনুরূপভাবে ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, صُومُوا التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ وَخَالِفُوا الْيَهُودَ 'তোমরা ৯ ও ১০ তারিখে ছিয়াম রাখো এবং ইয়াহূদীদের বৈপরীত্য করো'।[৪৭]

সুতরাং মুহাররমের দুটি ছিয়াম পালন করা উত্তম। এক্ষেত্রে ১০ তারিখের আগের দিন বা পরের দিন ছিয়াম রাখা যেতে পারে। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা থেকে বর্ণিত, صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا وَبَعْدَهُ يَوْمًا 'তোমরা আশূরার ছিয়াম পালন করো এবং ইয়াহূদীদের বিরোধিতা করো। তোমরা আশূরার আগের দিন অথবা পরের দিন ছিয়াম পালন করো'।[৪৮]

৪৩. ছহীহ বুখারী, হা/২০০৫; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৩১।
৪৪. ছহীহ বুখারী, হা/৫৩, ৮৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭।
৪৫. ছহীহ বুখারী, হা/২০০২; ছহীহ মুসলিম, হা/১১২৫।
৪৬. ছহীহ মুসলিম, হা/১১৩৪; আবূ দাঊদ, হা/২৪৪৫।
৪৭. তিরমিযী, হা/৭৫৫; বায়হাক্বী, হা/৮৬৬৫, হাদীছটি ছহীহ।
৪৮. আহমাদ, হা/২১৫৪; ইবনু খুযায়মা, হা/২০৯৫; জামেউছ ছগীর,

www.al-itisam.com

অতএব, সুন্নাত হলো ৯ ও ১০ অথবা ১০ ও ১১ মুহাররমের ছিয়াম রাখা।

আশূরায়ে মুহাররমে বর্জনীয়:

(১) হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যুবার্ষিকী পালন: হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর শাহাদতবরণের মর্মান্তিক ঘটনাটিও আশূরার দিনে অর্থাৎ ১০ মুহাররম তারিখে ঘটেছিল, যা মুসলিমদের জন্য নিঃসন্দেহে দুঃখজনক; কিন্তু এর জন্য সেদিনকে শোক দিবস হিসেবে পালন করা শরীআত সম্মত নয়।

(২) মাতম করা: আশূরার দিনকে কেন্দ্র করে অনেকে 'হায় হোসেন' 'হায় হোসেন' বলে বিলাপ করেন, বুক চাপড়ান এবং মাথায় কালো কাপড় বেঁধে শোক প্রকাশ করেন, যা সম্পূর্ণভাবে হারাম ও কাবীরা গুনাহ। সকল আলেম একমত যে, আওয়াজ করে মৃত ব্যক্তির জন্য কান্নাকাটি করা জায়েয নয়।

(৩) মর্ছিয়া করা: মর্ছিয়া (المرثية) আরবী শব্দ। যার অর্থ শোকগাথা, শোকসংগীত। আমাদের সমাজে কারবালার ইতিহাস নিয়ে বিভিন্ন রকম কবিতা, জারি গান, বিভিন্ন নভেল-নাটক ও গল্প-উপন্যাস লেখা হয়েছে। যার অধিকাংশ ভিত্তিহীন ও মনগড়া। যেখানে ইয়াযীদ ও তার পিতা বিশিষ্ট ছাহাবী মুআবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে হেয় করা হয়েছে। মীর মোশাররফ হোসেন কর্তৃক রচিত 'বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থটিকে কারবালার ইতিহাসগ্রন্থ মনে করা হয়। অথচ এই উপন্যাসের অধিকাংশ তথ্যই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। ইসলামে মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে এসকল কার্যকলাপ কখনো জায়েয নয়।

(৪) তা'যিয়া করা: তা'যিয়া (التعزية) আরবী শব্দ। যার অর্থ সান্ত্বনা দান করা, শোক প্রকাশ করা। আশূরার দিন হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কাল্পনিক কবর তৈরি করে তা'যিয়া বা শোক মিছিল করা হয়। ঐ ভুয়া কবরগুলোকে 'আত্মাসমূহের অবতরণস্থল' বলে ধারণা করা হয়। সেখানে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর রূহ হাযির হয় কল্পনা করে তাকে সালাম দেওয়া হয়, তার সামনে মাথা ঝুঁকানো হয়, সেখানে সিজদা করা হয়, মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য প্রার্থনা করা হয়। এগুলো স্পষ্ট শিরক। তা'যিয়া-মাতম বর্জন করে তাদের জন্য দু'আ করা উচিত।

(৫) নিজের উপর আঘাত করা ও কাপড় ছেঁড়া: আশূরার দিন অনেকে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যুকে স্মরণ করে, তার শোকে বিভিন্ন ধারালো জিনিস দিয়ে নিজের দেহকে আঘাত করে রক্তাক্ত করে এবং নিজের গায়ের কাপড় ছিঁড়ে ফেলে। এটা ইসলাম সমর্থন করে না। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ 'যারা শোকে মুখে চপেটাঘাত করে, জামা ছিন্ন করে ও জাহেলী যুগের মতো চিৎকার করে, তারা আমাদের দলভুক্ত নয়'।[৪৯]

ইসলামের ইতিহাসে এরকম অনেক দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু মুসলিমরা কারও জন্যই এ রকম শোক পালন করেন না।

(৬) ছাহাবা-তাবেঈনকে মন্দ বলা: আশূরার দিন হাসান ও হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-কে মর্যাদা দিতে গিয়ে অনেকে কোনো কোনো ছাহাবী ও তাবেঈ সম্পর্কে মন্দ ধারণা করে থাকেন। এমনকি গালিও দিয়ে থাকেন। আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর নামে একটি বকরি বেঁধে রেখে লাঠিপেটা ও অস্ত্রাঘাতে রক্তাক্ত করা হয়। এছাড়াও মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু ও তার ছেলে ইয়াযীদকে কারবালার ঘটনার জন্য দায়ী করে গালিগালাজ করে থাকেন। অথচ ছাহাবীগণকে গালি দেওয়া বড় গুনাহের কাজ।

(৭) বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করা: আশূরার নামে বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করা হয়। যেমন- সরকারি ছুটির ব্যবস্থা করা, রাস্তা-ঘাট বিভিন্ন রঙে সাজানো, লাঠি, তির, বল্লম নিয়ে যুদ্ধের মহড়া দেওয়া, হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নামে কেক ও পাউরুটি বানিয়ে 'বরকতের পিঠা' বলে বিক্রি করা ইত্যাদি।

(৮) কারবালার ঘটনাকে হক্ব ও বাতিলের লড়াই মনে করা: কারবালার ঘটনাকে অনেকে হক্ব ও বাতিলের লড়াই বলে আখ্যায়িত করেন। তারা হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে হক্ব ও ইয়াযীদকে বাতিল বলে মনে করেন। এই বিশ্বাস সঠিক নয়। বিষয়টি ছিল ইজতিহাদী বিষয়, হক্ব বাতিলের বিষয় ছিল না।

(৯) হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মাথা ছয়টি দেশে প্রেরিত হয়েছে বলে বিশ্বাস করা: শীআদের ওয়েবসাইটের তথ্য মতে, বর্তমানে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মাথা ছয়টি দেশে পূজিত হচ্ছে— ১. মদীনার বাক্বী' গোরস্থানে, তার মা ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর কবরের পাশে, ২. দামেস্কে হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মাথা বা মাসজিদুর রাস সংলগ্ন গোরস্থানে, ৩. মিশরের রাজধানী কায়রোতে, যা 'তাজুল হুসাইন' বা হুসাইনের মুকুট নামে খ্যাত, ৪. ইরানের মারভে, ৫. ইরাকের নাজাফে এবং ৬. কারবালা প্রান্তরে। কিন্তু এসব তথ্যগুলোতে কেউ একমত নন।[৫০]

উপসংহার:

এই মহিমান্বিত মাস ও আশূরার গুরুত্ব উপলব্ধি করে আমাদের উচিত যথাযোগ্য সম্মান, ইবাদত, আত্মসংযম ও সৎকর্মে মনোনিবেশ করা। হোক তা নফল ছিয়াম, ইবাদতে অতিরিক্ত যত্ন, তওবা কিংবা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে দৃঢ় অঙ্গীকার—মুহাররম ও আশূরা আমাদের জীবনে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ও নৈতিক উন্নতির এক অপূর্ব সুযোগ এনে দেয়। এই পবিত্র সময় যেন আমাদের জীবনে সত্য, শান্তি ও আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে অগ্রসর হওয়ার অনুপ্রেরণা হয়ে উঠে। আল্লাহ আমাদেরকে মুহাররম মাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে যথাযথ মূল্যায়ন করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

হা/৫০৫০, হাদীছটি ছহীহ।

৪৯. ছহীহ বুখারী, হা/১২৯৭।

৫০. https://www.alimamali.com/html/ara/ahl/sire/hosain/madfan-ras.htm

www.al-itisam.com

তীব্র গরমে মুমিনের পরীক্ষা: ইসলামের আলোকে তাপপ্রবাহের তাৎপর্য

-ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ*

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ আজ মানবজীবনের এক কঠিন বাস্তবতা। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষ অসহনীয় দাবদাহে কষ্ট পাচ্ছে। এই তাপপ্রবাহ শুধু আবহাওয়ার একটি স্বাভাবিক পরিবর্তন নয়; ইসলামের দৃষ্টিতে এটি একদিকে আল্লাহর নিদর্শন, অন্যদিকে মুমিনের জন্য পরীক্ষা, সতর্কবার্তা এবং আত্মশুদ্ধির সুযোগ। কুরআন মাজীদ ও হাদীছে এ বিষয়ে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ দিকনির্দেশনা রয়েছে, যা আমাদের জীবন পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

তাপপ্রবাহ: আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শন

কুরআন কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ ‘নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের পরিবর্তনে বোধসম্পন্নদের জন্য নিদর্শন রয়েছে’ *(আলে ইমরান, ৩/১৯০)*। এই আয়াত আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, প্রকৃতির প্রতিটি পরিবর্তন—তাপ, শীত, বৃষ্টি সবই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। তাপপ্রবাহও সেই নিদর্শনের অংশ, যা মানুষের চিন্তা ও আত্মজিজ্ঞাসাকে জাগ্রত করে।

তীব্র গরম: জাহান্নামের উত্তাপের একটি অংশ

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ‘নিশ্চয়ই এই উত্তাপ জাহান্নামের শ্বাস থেকে আসে’।[৫২] এই হাদীছ আমাদেরকে সতর্ক করে দেয় যে, দুনিয়ার এই গরম আখেরাতের কঠিন শাস্তির একটি ক্ষুদ্র নমুনা মাত্র। তাই এটি আমাদেরকে গুনাহ থেকে বিরত থাকতে এবং আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে উদ্বুদ্ধ করে।

তাপপ্রবাহ: মুমিনের জন্য পরীক্ষা

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ ‘আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব কিছু ভয়, ক্ষুধা, সম্পদ ও জীবনের ক্ষতি এবং ফল-ফসলের ক্ষতির মাধ্যমে; আর ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন’ *(আল-বাক্বারা, ২/১৫৫)*।

তাপপ্রবাহ সেই পরীক্ষারই একটি রূপ। একজন প্রকৃত মুমিন এই কষ্টের সময় ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহর উপর ভরসা রাখে এবং ইবাদতে অবিচল থাকে।

পানির নেয়ামত: জীবনের উৎস

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ ‘আমি পানি থেকে সব জীবন্ত জিনিস সৃষ্টি করেছি’ *(আল-আম্বিয়া, ২১/৩০)*। প্রচণ্ড গরমে পানির গুরুত্ব অপরিসীম। এটি শুধু দেহকে সুস্থ রাখে না, বরং আমাদেরকে আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই পানি অপচয় না করে সচেতনভাবে পানি ব্যবহার করাই ঈমানের অংশ।

বৃষ্টি: কষ্টের পর স্বস্তির বার্তা

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ ‘তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, যা দ্বারা তিনি মৃত ভূমিকে জীবিত করেন’ *(আর-রূম, ৩০/২৪)*। তাপপ্রবাহের পর বৃষ্টি আল্লাহর রহমতের প্রতীক। এটি আমাদেরকে শেখায়— কষ্টের পরই আসে স্বস্তি, তাই কখনো হতাশ হওয়া উচিত নয়।

ইবাদতে সহজীকরণ: ইসলামের বাস্তবতা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, إِذَا كَانَ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ ‘তোমরা তীব্র গরমে যোহরের ছালাত কিছুটা ঠাণ্ডা হলে আদায় করো’।[৫৩] এই হাদীছ প্রমাণ করে, ইসলাম মানুষের কষ্ট বিবেচনায় রেখে সহজ পথ নির্দেশ করে। তাপপ্রবাহেও ইবাদত যেন কষ্টকর না হয়, সে দিকেও ইসলাম গুরুত্ব দিয়েছে।

বাকি অংশ ৩৪ নং পেজে...

৫১. চিকিৎসক, কলামিষ্ট ও গবেষক; প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাতীয় রোগী কল্যাণ সোসাইটি।

৫২. ছহীহ বুখারী, হা/৩২৫৯; ছহীহ মুসলিম, হা/৬১৫।

৫৩. ছহীহ মুসলিম, হা/৬১৫।

www.al-itisam.com

পাপ-পুণ্য

-সাঈদুর রহমান*

প্রতিটি গুনাহ হয় ‘কাবীরা’ (বড় পাপ) হবে, না হয় ‘ছগীরা’ (ছোট পাপ) হবে। তবে কেউ যদি ছগীরা গুনাহ বারবার করতে থাকে, তবে তা একসময় কাবীরা গুনাহে পরিণত হয়। যেমন কেউ যদি নিয়মিত দাড়ি কাটে বা এই কাজে অবিচল থাকে, তবে সেটি আর ছগীরা গুনাহ থাকে না; বরং কাবীরা গুনাহ হয়ে যায়।

কখনো কখনো কাবীরা গুনাহ ‘ফাহেশা’ (অত্যন্ত অশ্লীল বা জঘন্য পাপ) হিসেবে গণ্য হয়, আবার ফাহেশা রূপান্তরিত হয় ‘আফহাশ’ (নিকৃষ্টতম পাপ)-এ। উদাহরণস্বরূপ, কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা একটি কাবীরা গুনাহ। কিন্তু কেউ যদি নিজের বাবা-মা, সন্তান, ভাই-বোন বা নিকটাত্মীয়কে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তবে তা কেবল কাবীরা গুনাহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তা ‘ফাহেশা’ বা তার চেয়েও ভয়াবহ পাপে পরিণত হয়।

ডান পাশের ফেরেশতা বাম পাশের ফেরেশতাকে বলেন, এখনই পাপটি লিখো না, দেখা যাক সে তওবা করে কি-না। যদি সে তওবা করে, তবে ওই পাপ আর লেখা হয় না। কিন্তু যদি সে তওবা না করে, তবে তার আমলনামায় মাত্র একটি পাপ লেখা হয়।

অন্যদিকে কেউ যদি কোনো পাপ কাজ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে, কিন্তু কোনো কারণে শেষ পর্যন্ত তা করতে না পারে; তবে (ইচ্ছা ও প্রচেষ্টার কারণে) তার আমলনামায় পাপ লেখা হয়। নবী ﷺ বলেন, إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ ‘যখন দুই মুসলিম তরবারি নিয়ে মুখোমুখি হয়, তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়েই জাহান্নামে যাবে’। আমি (বর্ণনাকারী) বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! হত্যাকারী তো বুঝলাম, কিন্তু নিহত ব্যক্তি কেন? তিনি বললেন, ‘কারণ সেও তার সঙ্গীকে হত্যা করতে আগ্রহী ছিল’।[৫৫]

এই হাদীছটি প্রমাণ করে যে, কেউ যদি কোনো পাপ কাজ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে এবং শেষ পর্যন্ত সফল হতে না পারে, তবুও সে ওই পাপের জন্য গুনাহগার বা পাপী হবে।

অন্যদিকে, কোনো অমুসলিম যদি তার কুফরী অবস্থায় থাকাকালীন কোনো ভালো কাজ করে এবং পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করে, তবে সে ওই ভালো কাজের ছওয়াব বা প্রতিদান পাবে। কিন্তু যদি সে ইসলাম গ্রহণ না করে কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে সে তার ভালো কাজের বিনিময় কেবল দুনিয়াতেই পেয়ে যাবে; পরকালে এর কোনো প্রতিদান পাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ ‘আর তারা যা কিছু আমল করেছে, আমরা সেগুলোর দিকে অগ্রসর হব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করে দিব’ *(আল-ফুরক্বান, ২৫/২৩)*।

কোনো কাফের যদি কাফের থাকাবস্থায় কোনো পাপ কাজ করে, এরপর সে ইসলাম গ্রহণ করে; তাহলে সে কাফের থাকা অবস্থায় যে পাপ কাজ করেছে, এগুলো মুছে যাবে। আমর ইবনুল আছ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, لَمَّا جَعَلَ اللهُ الْإِسْلَامَ فِي قَلْبِي، أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ ابْسُطْ يَمِينَكَ فَلْأُبَايِعْكَ، فَبَسَطَ يَمِينَهُ، فَقَبَضْتُ يَدِي، قَالَ: مَا لَكَ يَا عَمْرُو؟ قَالَ: قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ، قَالَ: تَشْتَرِطُ بِمَاذَا؟ قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ لِي، قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟ ‘যখন আল্লাহ আমার অন্তরে ইসলাম স্থাপন করলেন, আমি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বললাম, আপনার হাত বাড়ান, আমি বায়আত করব। তিনি হাত বাড়ালেন, কিন্তু আমি আমার হাত টেনে নিলাম। তিনি বললেন, ‘কী হয়েছে, হে আমর?’ আমি বললাম, আমি একটি শর্ত করতে চাই। তিনি বললেন, ‘কী শর্ত?’ আমি বললাম, আমার পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। তখন তিনি বললেন, ‘তুমি কি জানো না, ইসলাম পূর্বের সবকিছু ধ্বংস (মাফ) করে দেয়?’[৫৬]

ইসলাম গ্রহণ করার পর কেউ যদি পুনরায় আগের সেই একই পাপে লিপ্ত হয়, তবে তার ইসলাম পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী—উভয় সময়ের পাপের হিসাব নেওয়া হবে। নবী ﷺ বলেন, مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ ‘যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে ভালো কাজ করবে, জাহেলী যুগে সে কী করেছে তার জন্য পাকড়াও করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর পাপ কাজ করে, তাকে পূর্বের ও পরের উভয় পাপের জন্য পাকড়াও করা হবে’।[৫৭]

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পাপমুক্ত জীবন যাপন করার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

৫৪. শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, বীরহাটাব-হাটাব, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

৫৫. ছহীহ বুখারী, হা/৬৮৭৫।

৫৬. ছহীহ মুসলিম, হা/১২১।

৫৭. ছহীহ মুসলিম, হা/২১৮; মুহাল্লা, ১/১৯।

www.al-itisam.com



হারামাইনের মিম্বার থেকে

ব্যক্তি ও সমাজ সংশোধনের উপদেশ

[২২ শাওয়াল, ১৪৪৭ হি. মোতাবেক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ পবিত্র হারামে মাক্কীর (কা'বা) জুমআর খুৎবা প্রদান করেন **শায়খ ড. ছালেহ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু হুমাইদ** হাফিযাহুল্লাহ। উক্ত খুৎবা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন **ড. আব্দুল্লাহ বিন খোরশেদ**। খুৎবাটি 'মাসিক আল-ইতিছাম'-এর সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হলো।]

প্রথম খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য—যিনি চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর, মহাপবিত্র রাজাধিরাজ। একমাত্র তাঁরই প্রশংসা, যিনি বিশ্বজগতকে সর্বোত্তম নিয়মে সৃষ্টি করেছেন। আমি তাঁর প্রশংসা করি এবং তাঁর অগণিত নেয়ামতের জন্য শুকরিয়া আদায় করি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই; তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নেতা ও নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, যিনি সৃষ্টিজগতের মধ্যে সর্বোত্তম। আল্লাহ তাঁর উপর, তাঁর পবিত্র পরিবারবর্গ, সম্মানিত ছাহাবীগণ এবং তাদের অনুসারীদের উপর অগণিত দরূদ, সালাম ও বরকত অবতীর্ণ করুন।

অতঃপর, হে মানুষসকল! আমি নিজেকে ও আপনাদেরকে আল্লাহভীতি অবলম্বনের উপদেশ দিচ্ছি। সুতরাং আপনারা আল্লাহকে ভয় করে চলুন। গোপন ও প্রকাশ্য সকল অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করুন। রাগ ও সন্তুষ্টি উভয় অবস্থায় সত্যকে আঁকড়ে ধরুন। দারিদ্র্য ও সচ্ছলতা উভয় অবস্থায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করুন। বন্ধু অথবা শত্রু সবার সাথে ইনছাফ বজায় রেখে চলুন।

আর জেনে রাখুন! জান্নাত ব্যতীত সব নেয়ামতই তুচ্ছ, আর জাহান্নামের বিপদের তুলনায় অন্য সব বিপদ কিছুই না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বণ্টনে সন্তুষ্ট থাকে, তার কিছু হারানোতে দুঃখ থাকে না। আর কেবল সেই অন্যের পাপকে অনেক বড় মনে করে, যে নিজের পাপকে ভুলে যায়। শিষ্টাচারই সর্বোত্তম উত্তরাধিকার, আর উত্তম চরিত্রই শ্রেষ্ঠ সঙ্গী। মহান আল্লাহ বলেন, '(হে নবী!) আপনি ক্ষমার নীতি গ্রহণ করুন, সত্য-সঠিক কাজের আদেশ দিন আর জাহেলদেরকে এড়িয়ে চলুন' *(আল-আ'রাফ, ৭/১৯৯)*।

হে মুসলিমগণ! আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহতে উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য রয়েছে উপদেশ, আর যারা তা থেকে বিরত থাকে তাদের জন্য রয়েছে সতর্কবার্তা। এটি আলোকিত হৃদয়কে জাগ্রত করে এবং সচেতন ব্যক্তিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। কলব প্রবৃত্তিকে দমন করার মাধ্যমেই তা জীবিত হয়, আর সত্যিকারের আল্লাহভীতি গাফলতিকে দূর করে এবং সতর্কতার তির অলসতাকে বিদূরিত করে। যে ব্যক্তি নিজের ভুলত্রুটি স্মরণ করে, সে অনুতপ্ত হয় এবং যে নিজের পরিণতি নিয়ে চিন্তা করে, সে দৃঢ়সংকল্প হয়।

অতএব, আপনারা উপদেশ গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের হৃদয়কে জীবিত করুন, সতর্কবাণীর মাধ্যমে তা নমনীয় করুন এবং জ্ঞানগর্ভ কথায় তা আলোকিত করুন।

যদি আপনারা প্রতিপালকের অবাধ্য হয়ে চলে থাকেন, তবে ক্বিয়ামত দিবসের শাস্তিকে ভয় করুন। আর সর্বোপরি আপনারা উপদেশদাতাদের ভালোবাসুন। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ স্বীয় কিতাবে পূর্ববর্তী কিছু জাতির নিন্দা করেছেন এবং তাতে তাদের মন্দ কথাকে সংরক্ষণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তারা বলল, তুমি আমাদের উপদেশ দাও অথবা না দাও, উভয়ই আমাদের জন্য সমান। এসব (কথাবার্তা বলা) পূর্ববর্তী লোকদের অভ্যাস ছাড়া আর অন্য কিছুই না। আর আমরা আযাবপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হব না' *(আশ-শুআরা, ২৬/১৩৬-১৩৮)*। আর অন্য এক জাতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'আর তোমাদেরকে সদুপদেশ দিয়েছি, কিন্তু সদুপদেশ দানকারীদের তোমরা পছন্দ কর না' *(আল-আ'রাফ, ৭/৭৯)*।

হে ভ্রাতৃমণ্ডলী! সৌভাগ্য তার জন্য, যে সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই নিজের ভুলগুলো সংশোধন করে নেয়। সুসংবাদ তার জন্য, যে আল্লাহভীতি অবলম্বন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে। অভিনন্দন তার জন্য, যে মন্দ কাজের পর ভালো কাজ করে।

www.al-itisam.com

আর ক্ষতিগ্রস্ত সে, যে নিজের আখেরাতের মূল্যবান বিষয়গুলো দুনিয়ার তুচ্ছ জিনিসের বিনিময়ে বিক্রি করে। আফসোস তার জন্য, যে আল্লাহর হক্কের ব্যাপারে অবহেলা করে।

এই দুনিয়া একটি সফর মাত্র, তাই জীবন নিয়ে কালক্ষেপণ থেকে সাবধান থাকুন। দুনিয়ার দিনগুলো দ্রুত চলে যাওয়াই আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় উপদেশদাতা। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর ক্বিয়ামতের ব্যাপারটি শুধু চোখের পলকের ন্যায় কিংবা তা আরও নিকটবর্তী। নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান' *(আন-নাহল, ১৬/৭৭)*।

মৃত্যু সর্বদা আমাদের দিকে ওত পেতে আছে, আর প্রতিনিয়তই তা জীবনগুলোকে কেড়ে নিচ্ছে। আমাদের চোখগুলো স্থির হয়ে আছে, আর অন্তরগুলো সৎকর্মের প্রতিযোগিতা থেকে বিমুখ! তবে কি আমাদের দৃষ্টিশক্তি অন্ধ হয়ে গেছে? নাকি আমরা নিজেদের বিপদাপদ থেকে নিরাপদ মনে করছি?

হে আল্লাহর বান্দাগণ! দুনিয়ার জীবন যেন আপনাদের প্রতারিত না করে, কারণ এর সুখস্বাচ্ছন্দ্য স্থায়ী নয়। আর দীর্ঘ আশা যেন আপনাদের ধোঁকায় না ফেলে, কারণ মৃত্যু অবধারিত।

আল্লাহর শপথ! অবশ্যই আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে রাসূল ﷺ সম্পর্কে এবং যিনি তাঁকে প্রেরণ করেছেন তাঁর সম্পর্কে, কুরআন সম্পর্কে এবং যিনি তা নাযিল করেছেন তাঁর সম্পর্কে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার আমল অনুযায়ী প্রতিফল দেওয়া হবে।

জীবনই মূল পুঁজি এবং এর যে অংশ চলে গেছে, তা আর ফিরে আসবে না। আজকের দিন আমলের দিন, হিসাবের দিন নয় এবং আগামীকাল হবে হিসাবের দিন, আমলের সুযোগ থাকবে না।

সুতরাং এখনই কবর ও তার ভয়াবহতার জন্য প্রস্তুত হোন, ফেরেশতা ও তাদের প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত হোন। কে আছে, যে তার আমলনামা ডান হাতে পাবে? আর কে আছে, যে তা বাম হাতে গ্রহণ করবে?

হে ভ্রাতৃমণ্ডলী! আপনারা যখন সংশোধন ও আত্মসমালোচনার অবস্থায় আছেন, তখন আল্লাহ তাআলার এই বাণীটি নিয়ে একটু চিন্তা করুন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর অবশ্যই তারা বহন করবে তাদের বোঝা এবং তাদের বোঝার সাথে আরো কিছু বোঝা। আর তারা ক্বিয়ামতের দিন অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে সে সম্পর্কে, যা তারা মিথ্যা বানাত' *(আল-আনকাবূত, ২৯/১৩)*। এই আয়াতটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করুন। তারপর খেয়াল করুন সেই ব্যক্তির অবস্থা, যার অন্তরকে আল্লাহ গাফেল করে দিয়েছেন—সে মানুষের অধিকার হরণ করে, অন্যায়ভাবে তাদের সম্পদ ভোগ করে এবং অহেতুক তাদের সম্মানহানি করে (গীবত করে)।

আর লক্ষ্য করুন কিছু মানুষের অবস্থা, যারা বিভিন্ন যোগাযোগমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে কোনো যাচাই-বাছাই ছাড়াই যেকোনো তথ্য শেয়ার করে, নিশ্চিত না হয়েই কথা বলে, সত্যতা যাচাই না করেই প্রচার করে এবং তদন্ত ছাড়াই ভুয়া তথ্য ছড়িয়ে দেয়।

অতএব, এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করুন এবং ভাবুন, ক্বিয়ামতের দিন বান্দার কী অবস্থা হবে, যখন সে হঠাৎ দেখতে পাবে যে, তার আমলনামায় এমন ত্রুটিবিচ্যুতি ও গুনাহ লিপিবদ্ধ আছে, যা সে নিজে সরাসরি করেনি! তখন সে বহন করবে সেই কাজের পাপ, তা প্রচার করার পাপ, যারা তা বিশ্বাস করেছে তাদের পাপ, যারা তা শুনেছে তাদের পাপ, যারা তা দেখেছে তাদের পাপ, যাদেরকে তা বিভ্রান্ত করেছে তাদের পাপ, যাদের সংকল্প দুর্বল করেছে তাদের পাপ এবং যাদেরকে সত্য থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে বা মিথ্যাকে তাদের কাছে সুন্দর করে তুলেছে এসব কিছুর পাপ।

হে মুসলিমগণ! বিপদাপদের মধ্যেও দৃঢ় থাকাই আসল, সুস্থতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের সময়ে তো সবাই দৃঢ় থাকতে পারে। আর বিপদের মধ্যেও সন্তুষ্টি প্রকাশই প্রকৃত গুণ, আরাম-আয়েশের সময়ে তো এমনিতেই সবাই সন্তুষ্ট থাকে। যখন চাইতেই পাওয়া যায়, তখন সবাই আত্মবিশ্বাসী হতে পারে; কিন্তু যখন তা বিলম্বিত হয়, তখন কয়জনই বা আত্মবিশ্বাস ধরে রাখতে পারে?

বাহ্যিকভাবে সবাইকে ভালো মানুষ মনে হলেও, একান্ত নির্জনে আল্লাহই জানেন তারা কী করছে। আল্লাহ সেইসব মানুষের প্রতি রহম করুন, যাদের মনোবল উচ্চ, হৃদয় পবিত্র এবং যারা তাদের প্রতিপালকের বিধান মেনে চলে। কাজেই আপনারা তাদের মতো হওয়ার চেষ্টা করুন এবং তাদের কাজকে অনুসরণ করুন।

হে আল্লাহর বান্দা! মানুষের সন্তুষ্টির জন্য কখনো সত্যকে ছেড়ে দেবেন না, আর মানুষের প্রশংসা পাওয়ার জন্য নিজেকে মুখোশে আড়াল করবেন না। শুনে রাখুন! বান্দার জন্য সবচেয়ে উত্তম রিযিক হলো অন্তরের প্রশান্তি, আলোকিত বিবেক-বুদ্ধি, হৃদয়ের পবিত্রতা এবং নিরাপদ চিন্তা লাভ করা। আর সবচেয়ে উত্তম অর্জন হলো পিতা-মাতার দু'আ এবং একজন খাঁটি ও আন্তরিক বন্ধুর সহানুভূতি পাওয়া। আর প্রকৃত সৎ ভাই তো

www.al-itisam.com

সে-ই, যে আপনার অনুপস্থিতিতে শূন্যতা অনুভব করে, আপনি ভুল করলে আপনাকে সতর্ক করে এবং দু'আ করার সময় আপনাকে ভুলে যায় না।

হে ভ্রাতৃমণ্ডলী! কৃপণ ব্যক্তি সম্পদ জমা করে, কিন্তু সে যা জমা করে তা অন্যের কাছে চলে যায়। আর পরনিন্দাকারী ব্যক্তি ভালো কাজ করে, কিন্তু তার ছওয়াব অন্যের কাছে চলে যায়। আল্লাহর আনুগত্যের কষ্ট ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু তার প্রতিদান স্থায়ী; পক্ষান্তরে গুনাহের আনন্দ ক্ষণিক, কিন্তু তার শাস্তি স্থায়ী। ফুযাইল ইবনু ইয়ায রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তোমার কাছে কোনো গুনাহ যত ছোট মনে হবে, আল্লাহর কাছে তা ততই বড়। আর তোমার কাছে যত বড় মনে হবে, আল্লাহর কাছে তা ততই ছোট।

হে আমার প্রিয়জনেরা! আপনাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর। আপনাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো সে, যে কুরআন নিজে শেখে এবং অন্যকে শেখায়। আপনাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো সে, যে নিজের পরিবারের কাছে সবচেয়ে উত্তম। আর মানুষের জন্য উপকারী ব্যক্তিই সর্বোত্তম মানুষ।

বন্ধুদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো সে, যে তার বন্ধুর কাছে সবচেয়ে ভালো। প্রতিবেশীদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো সে, যে তার প্রতিবেশীর জন্য সবচেয়ে ভালো। আর আপনাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো সে, যে ছালাতের কাতারে সবচেয়ে নম্র ও কোমলভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ায়।

অতএব, আপনারা সৎকাজের মাধ্যমে নিজেদের উপকার করুন। যাকাত ও দান-ছাদাক্বার মাধ্যমে আপনাদের সম্পদের সঠিক ব্যবহার করুন। আর আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের সঙ্গে তাদের ভুলত্রুটি উপেক্ষা করে উত্তম আচরণ করুন। ভালো কাজের দিকে দ্রুত অগ্রসর হোন, ইবাদতে একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করুন। যা আপনাদের উপকারে আসে, তা অর্জনের চেষ্টা করুন; আল্লাহর কাছে বেশি বেশি সাহায্য চান এবং কখনোই নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করবেন না। কারণ শক্তিশালী মুমিন আল্লাহর কাছে দুর্বল মুমিনের তুলনায় উত্তম ও অধিক প্রিয়, যদিও উভয়ের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তাকে সঠিক পথ দেখান, তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান এবং তাকে রক্ষা করেন। যে ব্যক্তি নিশ্চিত জানে যে তাকে একদিন পরকালের পথে যাত্রা করতে হবে, সে অবশ্যই তার জন্য প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত থাকবে।

نفعني الله وإيَّاكم بهدي كتابِه، وبسنَّةِ نبيِّه محمدٍ ﷺ

দ্বিতীয় খুৎবা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সবকিছু অত্যন্ত সুন্দর ও নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই। যে তাঁর হেদায়াত অনুসরণ করে, সে কখনো পথভ্রষ্ট হয় না এবং দুর্ভোগে পতিত হয় না। আমি তাঁর প্রশংসা করি, তিনি পবিত্র ও মহান। আমি তাঁর শুকরিয়া আদায় করি, তিনি একমাত্র কৃতজ্ঞতার উপযুক্ত।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নেতা ও নবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, তিনি মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী। মহান আল্লাহ তাঁর উপর, তাঁর পরিবারবর্গ ও তাঁর ছাহাবীগণের উপর দরূদ, সালাম ও বরকত নাযিল করুন।

অতঃপর, হে আমার বন্ধুগণ! আপনারা নিজেদের সমাজকে রক্ষা করুন, নিজেদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখতে সচেষ্ট হোন এবং এমন সব বিষয় থেকে সতর্ক থাকুন, যা আপনাদের ঐক্যে ফাটল ধরায়। কারণ এই সমাজে সুযোগসন্ধানী ও অন্যের ভুল অনুসন্ধানকারী লোকের অভাব নেই। নিশ্চয়ই মুনাফেক্ব ব্যক্তি অশ্লীলতা ও অনৈতিকতা ছড়ায়, আর সুযোগসন্ধানী ব্যক্তি ছোট ভুলকেও বড় করে তোলে।

আপনারা আনুগত্য ও শৃঙ্খলার সাথে দৃঢ় থাকুন; কারণ যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে বের হয়ে যায় এবং জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যুর ন্যায়। কাজেই আপনারা আল্লাহকে ভয় করে চলুন।

হে পরম করুণাময় আল্লাহ! আমাদের অন্তরগুলোকে তওবার আলোয় উদ্ভাসিত করুন, আপনার দিকে ফিরে আসার সৌভাগ্য দান করুন। আমাদের জন্য আপনার রহমত, কবুলিয়্যাত ও দু'আ কবুলের দরজাগুলো উন্মুক্ত করে দিন।

হে দয়াময় প্রতিপালক! আমাদের ইবাদতসমূহ কবুল করুন, আমাদের প্রার্থনাগুলো গ্রহণ করুন, আমাদের আমলসমূহকে পরিশুদ্ধ করুন, আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন, আমাদের ত্রুটিবিচ্যুতিগুলো দূর করে দিন, আমাদের তওবা কবুল করুন, আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া বর্ষণ করুন। নিশ্চয়ই আপনি অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

www.al-itisam.com

কুরআনের মর্মবাণী

রবের বাণী

-আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাযযাক*

(পর্ব-৬)

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

মহান আল্লাহ পূর্বের আয়াতে শিরক না করার যে আদেশ দিয়েছেন, সে আদেশ অনেক সময় এ অজুহাতে লঙ্ঘন করা হয় যে, তারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্যই এসব শিরক করে। যেমন তারা বলে, 'আমরা আল্লাহর নিকটবর্তী বান্দাদের সন্তুষ্টির মাধ্যমে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে চাই'।

তাই যখন আল্লাহ স্পষ্টভাবে শিরক না করার নির্দেশ দেন, তখন সন্দেহ তৈরি হয়—এই আদেশ সত্যিই আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে কি-না। এজন্যই আল্লাহ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলছেন, 'আমি আমার বান্দার উপর যে কুরআন নাযিল করেছি, সে বিষয়ে যদি তোমাদের সন্দেহ থাকে, তবে এর মতো একটি সূরা নিয়ে আসো...'।

এটি শুধু একক চ্যালেঞ্জ নয়। বরং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সব সাহায্যকারী—মানুষ, জিন, শয়তান সবাইকে ডাকো, সবার সাহায্য নাও! সবাই মিলে চেষ্টা করো! যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾

'তোমরা কখনো তা পারবে না'। আর যখন তোমরা কুরআনের একটি সূরার মতো কোনো সূরা বানাতে পারবে না, তখন এটি প্রমাণিত হবে যে, কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ। আর এটি প্রমাণিত হওয়ার পরও যদি তোমরা শিরকে লিপ্ত থাকো, তবে জাহান্নামকে ভয় করো! তোমাদের জন্য রয়েছে সেই জাহান্নাম যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আর যার জ্বালানি মানুষ ও পাথর।

এখানে গভীর তাৎপর্য আছে। যারা মূর্তি পূজা, খাম্বা পূজা ও করব পূজার মাধ্যমে শিরক করে, তাদের এই সকল শিরকগুলো ইট-পাথরের তৈরি। আল্লাহ জানিয়ে দিলেন, তোমরা যেমন জাহান্নামে থাকবে, তেমনি যাদের উপাসনা করতে সেই পাথরের মূর্তি ও খাম্বাও সেখানে থাকবে। এটি তাদের জন্য চরম লাঞ্ছনা ও শিক্ষা।

﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

আল্লাহ তাঁর নিয়ম অনুযায়ী জাহান্নামের বর্ণনার পরই জান্নাতের সুসংবাদ দেন। তিনি বলেন, 'সুসংবাদ দিন তাদেরকে, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে...'।

এখানে লক্ষ্যণীয়, আল্লাহ অধিক আমলের কথা বলেননি; বলেছেন, সৎ আমল। সৎ আমল মানে দুটি শর্ত— ১. ইখলাছ, লোক দেখানো নয়; একমাত্র আল্লাহর জন্য। ২. সুন্নাহর অনুসরণ, নিজের মনমতো ইবাদত নয়; রাসূল ﷺ—এর পদ্ধতিতে হতে হবে।

ঈমান ও সৎ আমল যাদের থাকবে, তাদের জন্য থাকবে জান্নাত, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে নদীনালা। যখনই তাদের ফলমূল দেওয়া হবে, তারা বলবে, 'এ রিযিক তো আমরা পূর্বেও পেয়েছি'। অর্থাৎ ফলগুলো দুনিয়ার পরিচিত ফলের মতো হবে কিন্তু স্বাদ, গুণ ও আনন্দ হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও উন্নত। প্রতিবারই নতুন স্বাদ অনুভূত হবে। সেখানে তাদের জন্য থাকবে পবিত্র সঙ্গী এবং তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে।

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾

সূরা আল-বাক্বারা একটি মাদানী সূরা। এই সূরার পূর্বে অবতীর্ণ হওয়া কিছু মাক্কী সূরায় যেমন সূরা আল-হাজ্জ এর ৭৩ নম্বর আয়াতে মাছি ও সূরা আল-আনকাবূত এর ৪১ নম্বর আয়াতে

৫৮. ফাযেল, দারুল উলূম দেওবান্দ, ভারত; বিএ (অনার্স), মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; এমএসসি, ইসলামিক ব্যাংকিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইউনিভার্সিটি অফ ডান্ডি, যুক্তরাজ্য।

www.al-itisam.com

মাকড়সাসহ বিভিন্ন ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দেওয়া হয়েছিল। কুরআনের প্রতি সন্দেহ পোষণের দলীল হিসেবে কেউ কেউ এগুলোকে পেশ করত। তাদের জবাব দিয়ে কুরআনের সত্যতা প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত আয়াতের ধারাবাহিকতায় মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো উদাহরণ দিতে লজ্জাবোধ করেন না— তা মশা হোক বা তার চেয়েও ক্ষুদ্র কিছু'।

আল্লাহ বোঝাতে চেয়েছেন, সৃষ্টির ক্ষুদ্রতা দিয়ে তার গুরুত্ব নির্ধারিত হয় না। ছোট প্রাণীর মধ্যেও রয়েছে বিস্ময়কর হিকমাহ ও নিখুঁত সৃষ্টি। যেমন মশা মানুষের গন্ধ ও নিঃশ্বাস চিনতে পারে। মশার হুল থেকে এমন এনজাইম নিঃসরণ হয়, যা ব্যথানাশক এনেস্থিসিয়ার মতো কাজ করে। মানুষ শুরুতে বুঝতে পারে না। আবার মাছির চোখে ৬ হাজার লেন্স থাকে। সামনে পিছনে সব দিকে একসাথে দেখতে পায়। সে তার পা দিয়ে খাবারের স্বাদ নেয়। অন্যদিকে মাকড়সার শরীর থেকে যে মানের ফাইবার বের হয়, সেই মানের ফাইবার মানুষ এখনো তৈরি করতে পারেনি। মাকড়সার জ্যামিতিক সূক্ষ্মতাও অনেক আশ্চর্যের। যাহোক, মুমিনরা বুঝে এটি তাদের রবের পক্ষ থেকে সত্য। আর কাফেররা বলে, 'এ উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী বোঝাতে চাইলেন?'

আল্লাহ চাইলে তো সমালোচনা এড়ানোর জন্য এমন উদাহরণ নাও দিতে পারতেন। মহান আল্লাহ জানিয়ে দিচ্ছেন, এগুলো সবই পরীক্ষা। বাস্তব জীবনে বিপদে পড়লে যেমন বন্ধুর পরিচয় বুঝা যায়, আল্লাহর প্রতি মানুষের ধারণা কেমন এই ধরনের উদাহরণ ও আয়াতের প্রতি ঈমান থেকে সেটা বুঝা যায়।

এর মাধ্যমে অনেকেই হেদায়াত পায়, অনেকেই পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। তবে পথভ্রষ্ট হয় কেবল ফাসেকরা।

﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾

কারা সেই ফাসেক? 'যারা আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত'।

রূহের জগতে মানুষ আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছে, তাঁকেই রব হিসেবে মানবে। কিন্তু তারা সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে এবং সমাজে ফেতনা সৃষ্টি করে। এই তিনটির প্রত্যেকটিই একটি আরেকটির সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহর সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করলে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা সহজ হয়ে যায়। আর এই দু'টি ঘটলে ফাসাদ এমনিই ছড়িয়ে পড়ে।

অতএব, এই আয়াতসমূহে তিনটি বিষয় স্পষ্ট— ১. শিরকের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত চ্যালেঞ্জ। ২. কুরআনের ভাষাগত ও জ্ঞানগত মু'জিযা। ৩. ঈমান ও ফিসক্বের মধ্যকার পার্থক্য, যেখানে একই উদাহরণ কারও জন্য হেদায়াত, কারও জন্য পথভ্রষ্টতার কারণ।

(ইনশা-আল্লাহ! চলবে)

কুরবানীর পর পরিচ্ছন্নতার বাকি অংশ

এ হাদীছ আমাদের শেখায়, মানুষের চলাচলের পথ পরিষ্কার রাখা কেবল শিষ্টাচার নয়; বরং এটি ছওয়াবের কাজ। আরেক হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ قَالُوا وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ 'তোমরা দু'টি অভিশাপযোগ্য কাজ থেকে বেঁচে থাকো। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, সেগুলো কী? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি মানুষের চলার পথে বা তাদের ছায়াস্থানে মলত্যাগ করে'।[৩৪]

এই হাদীছ থেকে বোঝা যায়, মানুষের ব্যবহৃত স্থানে নোংরা করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। সুতরাং কুরবানীর বর্জ্য জনপথে বা উন্মুক্ত স্থানে ফেলে রাখা কতটা অনুচিত, তা সহজেই অনুধাবন করা যায়।

চামড়া ব্যবস্থাপনাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কুরবানীর পর দ্রুত চামড়া সংরক্ষণ করে তা বিক্রি বা মাদরাসা, মসজিদ কিংবা ইয়াতীমখানায় দান করা যেতে পারে। এতে একদিকে অপচয় রোধ হয়, অন্যদিকে সমাজের উপকার সাধিত হয়।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাও সমান জরুরী। যারা কুরবানী বা মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণের কাজে যুক্ত থাকবেন, তাদের গ্লাভস, মাস্ক ও পরিষ্কার পোশাক ব্যবহার করা উচিত। কাজ শেষে ভালোভাবে হাত-মুখ ধুয়ে নেওয়া প্রয়োজন।

সবশেষে বলতে হয়, কুরবানীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেবল কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব নয়; বরং এটি আমাদের সবার সম্মিলিত দায়িত্ব। আমরা যদি নিজ নিজ অবস্থান থেকে সচেতন হই, তাহলে পরিবেশ দূষণ অনেকাংশে কমানো সম্ভব।

কুরবানীর প্রকৃত শিক্ষা হলো ত্যাগ, সংযম ও দায়িত্ববোধ। এই ত্যাগ যেন কেবল পশু যবেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে; বরং আমাদের আচরণে, চিন্তায় এবং সামাজিক দায়িত্ব পালনের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়— সেটিই হওয়া উচিত আমাদের লক্ষ্য।

আসুন! আমরা কুরবানীর এই মহান ইবাদতকে পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলা ও মানবকল্যাণের সঙ্গে যুক্ত করি। তবেই আমাদের ঈদ হবে পরিপূর্ণ অর্থবহ, আনন্দময় এবং বরকতময়।

৩৪. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৯; মিশকাত, হা/৩৩৯।

www.al-itisam.com

উসওয়াতুন হাসানাহ

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অতুলনীয় বিনয়

-হাসান আল-বান্না মাদানী*

মানুষের মনে যদি কখনো অহংকার ও অহমিকার অনুভূতি আসে, তাহলে তার স্মরণ করা উচিত যে, সে মহাপরাক্রমশালী, বিশ্বজাহানের মহাপরিচালক ও মহান স্রষ্টার এ বিশাল জগতে সামান্য মাটি থেকে তৈরি ছোট্ট একটি সৃষ্টি মাত্র। সে আদম আলাইহিস সালাম -এর অগণিত সন্তানের একজন, যাদের অধিকাংশই তার চেয়ে অধিক ক্ষমতাধর ও অধিক অর্থশালী। তার হাতে যত নেয়ামত রয়েছে, সবই সেই মহান দয়ালু ও অনুগ্রহশীলের পক্ষ থেকে আসা। মানুষ শিক্ষা ও মর্যাদার যতই উঁচু শিখরে পৌঁছে যাক না কেন, আর্থিক দৃঢ়তার যেই স্থানেই অবস্থান করুক না কেন, তার এ কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, সে এক অস্থায়ী পৃথিবীতে বসবাস করে। মধ্যাহ্নে সূর্য যতই তীব্র থাকুক না কেন সন্ধ্যাবেলায় তা অবশ্যই নিস্তেজ হয়ে যায়। এ পৃথিবীতে কিছুই স্থায়ী নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ﴾ ‘তোমাদের কাছে যা আছে, তা নিঃশেষ হবে এবং আল্লাহর কাছে যা আছে, তা স্থায়ী’ *(আন-নাহল, ১৬/৯৬)*।

প্রকৃত মুমিন এ পৃথিবীতে এমনভাবে জীবন পরিচালনা করে যে, তার কাছে যতই সম্পদ থাকুক না কেন তার বাচনে ও আচরণে সর্বদা বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ পায়। তার কাছে যতই নেয়ামত থাকুক না কেন সে মানুষকে হেয় জ্ঞান করে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ দুনিয়া ও আখেরাতে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। তিনি যে শিক্ষায় শিক্ষিত তার সাথে পৃথিবীর কোনো শিক্ষার তুলনা হয় না। তাকে আখেরাতে যত নেয়ামত দান করা হয়েছে, তার সামনে সারা পৃথিবীর নেয়ামত মূল্যহীন।

তাই কোনো প্রকৃত জ্ঞানী মানুষ নিজেকে তার চেয়ে বেশি জ্ঞানী মনে করতে পারে না। কোনো প্রকৃত সভ্য ব্যক্তি নিজেকে তার চেয়ে অধিক সভ্য মনে করতে পারে না। তা সত্ত্বেও রাসূল ﷺ যত বিনয়ী ও নম্র হয়ে জীবনযাপন করেছেন, তা সারা বিশ্বের জন্য অনুপম আদর্শ হয়ে থাকবে।

عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالاَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَجْلِسُ بَيْنَ ظَهْرَىْ أَصْحَابِهِ فَيَجِيءُ الْغَرِيبُ فَلاَ يَدْرِى أَيُّهُمْ هُوَ حَتَّى يَسْأَلَ.

আবূ হুরায়রা ও আবূ যার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা হতে বর্ণিত, তারা বলেন, রাসূল ﷺ ছাহাবায়ে কেরামের মাঝে এমনভাবে বসতেন যে, যখন বহিরাগত কেউ আসত (যে তাকে পূর্বে কখনো দেখেনি) সে বুঝতেই পারত না যে, কে এদের মধ্যে রাসূল ﷺ; বরং তাকে জিজ্ঞেস করতে হতো যে, কে রাসূল ﷺ।[৬০]

রাসূল ﷺ সর্বদা তাঁর সাথীবর্গের খোঁজখবর রাখতেন। কোনো ছাহাবী নাম-পরিচয় ও মান-মর্যাদায় তুলনামূলক কম হলেও তিনি রাসূল ﷺ -এর নিকট যথেষ্ট সম্মান পেতেন।

আবূ বারযাহ আল-আসলামী রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, কোনো এক যুদ্ধ শেষে রাসূল ﷺ ছাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কেউ কি নিখোঁজ আছে?’ তারা বললেন, অমুক অমুককে পাওয়া যাচ্ছে না। রাসূল ﷺ আবারও জিজ্ঞেস করলেন, ‘আরও কেউ নিখোঁজ আছে কি?’ তারা বললেন, আমরা অমুক অমুককে দেখতে পাচ্ছি না। রাসূল ﷺ আবারও প্রশ্ন করলেন। ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা আর কাউকে নিখোঁজ দেখছি না। রাসূল ﷺ বললেন, ‘কিন্তু আমি জুলায়বীবকে[৬১] খোঁজ করছি। যাও তোমরা দেখো, সে কোথায় আছে’। ছাহাবায়ে কেরাম খোঁজ করতে গিয়ে দেখলেন তাকে হত্যা করা হয়েছে আর তার পাশে সাত জন নিহত পড়ে আছে। রাসূল ﷺ তার কাছে গেলেন এবং তার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘(জুলায়বীব) সাত জনকে

৫৯. কালিয়াচক, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত; মুহাদ্দিছ, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

৬০. আবূ দাউদ, হা/৪৬৯৮।

৬১. একজন আনছার ছাহাবী। দুয়েকটি হাদীছেই তার উল্লেখ পাওয়া গেছে। তিনি দেখতে একটু অসুন্দর ছিলেন। তার সম্পর্কে আর কোনো তথ্য পায়নি (দেখুন: মুসনাদ আবূ ইয়া‘লা, হা/৩৩৪৩; ইবনুল আছীর, উসদুল গাবাহ, ১/৫৫০; ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ, ১/৬০০)।

www.al-itisam.com

হত্যা করেছে, তারপরে তারা তাকে হত্যা করেছে। সে আমার খুব কাছের, তার ও আমার মাঝে অতীব গভীর সম্পর্ক’। অতঃপর রাসূল ﷺ তাকে নিজে দুই হাতে উঠালেন এবং তাকে দাফন করা হলো।[৬২]

ত্বয়ালিসীর বর্ণনায় রয়েছে, فُوُضِعَ عَلَى ذِرَاعَيِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى حُفِرَ لَهُ فَمَا كَانَ لَهُ سَرِيرٌ إِلَّا ذِرَاعَيِ النَّبِيِّ ﷺ. ‘কবর খনন করা পর্যন্ত রাসূল ﷺ-এর হাতদ্বয়ই ছিল তার শয্যা’।[৬৩]

জুলাইবীবের মতো একজন সাধারণ ছাহাবীর প্রতিও রাসূল ﷺ-এর এত স্নেহ তাঁর বিনয় ও নম্রতার প্রকাশ্য প্রমাণ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন হেঁটে যেতেন, তখন ছোট ছোট বাচ্চাদের সাথে তাঁর দেখা হতো। তিনি অপেক্ষা করতেন না যে, আমি তো রাসূল, তারা আমাকে সালাম করবে; বরং তিনি নিজেই তাদেরকে সালাম দিতেন।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْعَلُهُ .

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, তিনি একদিন নজকয়কে শিশুর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি তাদেরকে সালাম করলেন। অতঃপর বললেন, নবী ﷺ এরূপ করতেন।[৬৪]

عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَزُورُ الْأَنْصَارَ فَيُسَلِّمُ عَلَى صِبْيَانِهِمْ، وَيَمْسَحُ بِرُءُوسِهِمْ، وَيَدْعُو لَهُمْ».

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ﷺ কখনো কখনো আনাছরীদের সাথে দেখা করতে যেতেন, তাদের সোনামণিদের সাথে সাক্ষাৎ হলে তাদেরকে সালাম করতেন, তাদের মাথায় হাত বুলাতেন এবং তাদের জন্য দু‘আ করতেন।[৬৫]

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল ﷺ আমাদের সাথে মিশতেন, তাঁর সদাচরণ ছিল অতুলনীয়। আবূ উমাইর[৬৬] বলে আমার একটি ভাই ছিল, তিনি যখন আসতেন আবূ উমাইরকে বলতেন, يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟ ‘হে আবূ উমায়ের! কী অবস্থায় সে নুগায়ের?’[৬৭+৬৮]

আবূ দাউদের বর্ণনা অনুযায়ী, পাখিটি মারা যাওয়ায় আবূ উমাইর খুব দুঃখ পেয়েছিল, তখন রাসূল ﷺ তাকে এরূপ বলেছিলেন।[৬৯]

যখন নবী ﷺ বাসায় অবস্থান করতেন, তখন তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতো থাকতেন। নিজের সেবা নিজে করতেন এবং বাসার ছোট ছোট কাজে অংশ নিতেন।

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূল ﷺ অন্যান্য মানুষের মতোই একজন মানুষ ছিলেন, (যখন বাড়িতে থাকতেন) কাপড় থেকে উকুন পরিষ্কার করতেন, দুধ দোহন করতেন এবং নিজের সেবা নিজেই করতেন।[৭০]

عَنْ أَنَسٍ ﷺ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا مُحَمَّدُ يَا سَيِّدَنَا وَابْنَ سَيِّدِنَا، وَخَيْرَنَا وَابْنَ خَيْرِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، وَلَا تَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيَاطِينُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي أَنْزَلَنِيهَا اللهُ».

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক ব্যক্তি এসে রাসূল ﷺ-কে বললেন, হে মুহাম্মাদ! হে আমাদের নেতা![৭১] হে আমাদের নেতার সন্তান! হে সর্বোত্তম ও সর্বোত্তমের সন্তান! রাসূল ﷺ বললেন, ‘তোমরা কথা বলায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করো, শয়তানের প্রতিনিধি হয়ে যেয়ো না, আমি মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল, আমি পছন্দ করি না যে, তোমরা আমাকে সেই স্থান থেকে উঁচু করো, যে স্থান আল্লাহ তাআলা

৬২. ছহীহ মুসলিম, হা/২৪৭২।
৬৩. মুসনাদ ত্বয়ালিসী, হা/৯৬৬; ইবনু আব্দিল বার্র এরই কাছাকাছি অর্থবোধক একটি শব্দ বর্ণনা করেছেন এবং সেটিকে ছহীহ বলেছেন (দেখুন: আল-ইসতীআব, ১/২৭৩)।
৬৪. ছহীহ বুখারী, হা/৬২৪৭; ছহীহ মুসলিম, হা/২১৬৮।
৬৫. নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা, হা/৮২৯১।
৬৬. তার পিতার নাম আবূ তালহা যায়েদ ইবনে সাহল, তার ও আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা-এর মা এক; তবে বাবা ভিন্ন (দেখুন: আল-ইসতীআব, ৪/১৭২১)।
৬৭. নুগায়ের শব্দটির আসল রূপ নাগর, একটি ছোট পাখি বিশেষ।
৬৮. ছহীহ বুখারী, হা/৬১২৯; ছহীহ মুসলিম, হা/২১৫০।
৬৯. আবূ দাউদ, হা/৪৯৬৯।
৭০. মুসনাদ আহমাদ, হা/২৬১৯৪।
৭১. আরবী শব্দ সায়্যিদুনা এর অর্থ আমাদের নেতা। অন্য হাদীছে রাসূল ﷺ নিজের জন্য সায়্যিদ শব্দ ব্যবহার করেছেন (ছহীহ মুসলিম, হা/২২৭৮)। হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে সায়্যিদের আখ্যা দিয়েছেন (ছহীহ বুখারী, হা/৩৬২৯)। আর সা‘দ ইবনে মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর জন্যও এই উপাধি ব্যবহার করেছেন (ছহীহ বুখারী, হা/৩০৪৩)। নিঃসন্দেহে রাসূল ﷺ মুসলিম উম্মাহর নেতা, তারপরও ছাহাবী ও তাবেঈদের ভাষায় দরূদে তাঁর জন্য সায়্যিদুনা শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায় না এবং এই ধরনের শব্দ যে গুলূ ও অতিরঞ্জনের দিকে নিয়ে যায় তা বলাই বাহুল্য। ছাহাবী ও তাবেঈগণ রাসূল ﷺ-এর অসংখ্য হাদীছ বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাতেও রাসূল ﷺ-কে সায়্যিদুনা বলে আখ্যায়িত করা হয়নি। তাই রাসূল ﷺ-এর জন্য উক্ত শব্দটি প্রয়োগ করায় সতর্কতা অবলম্বন করাই সমীচীন বলে মনে হয়। ওয়াল্লাহু আ‘লাম (দেখুন: বকর আবূ যায়েদ, মু‘জামুল মানাহিল লাফযিয়্যাহ, পৃ. ১৩৪; আলবানী; আছলু ছিফাতি ছলাতিন্নাবী, ৩/৯৪১)।

www.al-itisam.com

আমাকে দান করেছেন’।[৭২] ইবনু কুরকুল বলেন, (এ হাদীছ দ্বারা রাসূল ﷺ) তাদেরকে প্রশংসায় অতিরঞ্জন করা থেকে নিষেধ করেছেন।[৭৩]

আব্দুল্লাহ ইবনে শিখখীরের হাদীছে প্রায় এভাবেই রাসূল ﷺ-এর প্রশংসা করা হয়েছিল, তখন তিনি বললেন, قولوا بقولكم أو بعض قولكم ‘তোমরা কথা বলায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করো’। আযীমাবাদী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, এর অর্থ হতে পারে এই যে, রাসূল ﷺ অতীব বিনয়ী হয়ে উপরিউক্ত প্রশংসাগুলো হতে কিছু ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।[৭৪]

কিন্তু যদি মানুষ বিনয়ী না হয়, তাহলে সে প্রশংসা ও তার মাত্রা সম্পর্কে সজাগ থাকে না।

রাসূল ﷺ গাধার মতো নিম্ন শ্রেণির পশুর উপর আরোহণ করেছেন।

عن أسامة بن زيد ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ، عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ، وَأُسَامَةُ وَرَاءَهُ.

উসামা ইবনে যায়েদ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল ﷺ একটি গাধার উপর আরোহণ করলেন, যার পিঠে একটি পালান রাখা ছিল এবং পালানের নিচে একটি ঝালরবিশিষ্ট ফাদাকী[৭৫] কাপড় বিছানো ছিল। রাসূল ﷺ-এর পিছনে উসামা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বসে ছিলেন।[৭৬]

কোথাও আমন্ত্রণ পেলে আমরা বিশেষ আতিথ্য আশা করি। সম্পর্কের উপর বস্তুকে প্রাধান্য দিই। ত্রুটি চোখে পড়লে সেটাকে চাপা না দিয়ে তা নিয়ে সমালোচনা করি। দস্তরখানে যদি অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে সাধারণ খাবার পেশ করা হয়, তাহলে সন্তুষ্ট হওয়া কঠিন হয়ে যায়। কিন্তু রাসূল ﷺ খাবারকে নয়, আমন্ত্রণকারীর আন্তরিকতাকে মূল্যায়ন করতেন।

আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘যদি আমাকে একটি পায়া কিংবা হাতের অংশ খেতেও ডাকা হয়, তবুও আমি সেই দাওয়াত কবুল করব এবং যদি আমাকে উপহারস্বরূপ একটি পায়া কিংবা হাতের অংশ দেওয়া হয়, তবুও আমি তা গ্রহণ করব’।[৭৭]

৭২. নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা, হা/১০০০৬।
৭৩. মাত্বালিউল আনওয়ার, ২/১১০।
৭৪. আওনুল মা‘বূদ, ১৩/১১১।
৭৫. ফাদাক মদীনার পূর্ব উত্তরে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক স্থান, সপ্তম হিজরীতে কোনো যুদ্ধ ছাড়াই স্থানটি বিজিত হয় (দেখুন: সামআনী, আল-আনসাব, ১০/১৫০; হামাবী, আল-মু‘জামুল বুলদান, ৪/২৩৮)।
৭৬. ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৬৪; ছহীহ মুসলিম, হা/১৭৯৮।
৭৭. ছহীহ বুখারী, হা/২৫৬৮।

রাসূল ﷺ যে ঘরে অবস্থান করতেন, যে বালিশের উপর মাথা রাখতেন এবং যা কিছু ব্যবহার করতেন তা হতো একেবারেই সাধারণ।

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে দেখলাম যে, তিনি একটি চাটাইয়ের উপর শুয়ে আছেন। মাথার তলায় ছাল-খোসা ভরা চামড়ার একটি বালিশ। তাঁর পায়ের কাছে কোনো এক প্রকার আঠা রাখা আছে এবং মাথার দিকে কিছু চামড়া ঝুলন্ত। আমি দেখলাম রাসূল ﷺ-এর শরীরের এক পার্শ্বে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গেছে। এ অবস্থা দেখে আমি কাঁদতে লাগলাম। রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি কেন কাঁদছ?’ উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বললেন, কিসরা ও কায়সার কতই না নেয়ামত ভোগ করছে এবং আপনি রাসূল হওয়া সত্ত্বেও (আপনার এই করুণ অবস্থা!)। রাসূল ﷺ বললেন, ‘উমার! তুমি কি সন্তুষ্ট নও যে, পৃথিবীর সব নেয়ামত তারা পেয়ে যাক আর আখেরাতের সব নেয়ামত আমরা পেয়ে যাই?’[৭৮]

আজ বহু মুসলিম এ কথা বুঝে না যে, আমাদের রাসূল ﷺ-ই সর্বোত্তম, তাঁর আদর্শই প্রকৃত সফলতার পথ। তাঁর আনিত শিক্ষা ও সভ্যতাই কল্যাণের চাবি। আমাদের অধিকাংশই আমলগতভাবে মানতে পারেনি যে, কুরআন ও হাদীছের শিক্ষাই সর্বশ্রেষ্ঠ। আমরা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখলেও আখেরাতকে ভালোবাসতে পারিনি। দ্বীনী শিক্ষার উন্নয়নে ব্যয় করলেও দ্বীনী শিক্ষার আমেজ অনুভব করতে পারিনি। আমাদের আচরণে স্পষ্ট দ্বিচারিতা দেখা যায় যে, আমরা ইসলামী শিক্ষার প্রতি তৎপরতা দাবি করি ঠিকই; কিন্তু নিজের পরিবারে সেই শিক্ষাকে স্থান দিতে পারি না। আখেরাতকে প্রাধান্য না দেওয়ায় আমরা বস্তুবাদী হয়ে পড়েছি। দিনের পর দিন আমাদের ইসলামী সভ্যতা অনৈসলামিক সভ্যতার সাথে মিশে যাচ্ছে। অহীর আলো থেকে দূরে সরে যাওয়ায় আমাদের হৃদয় কঠোর হয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, সমাজে কঠোরচিত্ত অহংকারীদের সংখ্যা যত বেশি হবে, মানুষের জীবন থেকে সুখ-শান্তি ততই কমে যাবে। তাই মানুষের হৃদয় থেকে এই অহংকার ও কঠোরতা মুছে ফেলার জন্য আমাদের সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে, তাহলেই আমরা রাসূল ﷺ-এর প্রকৃত অনুসারী হতে পারব। আল্লাহ তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

৭৮. ছহীহ বুখারী, হা/৪৯১৩।

www.al-itisam.com

খুলুকুল মুসলিম

ছাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লা-হু আনহুম -এর সাথে একজন মুসলিমের আচরণ

মূল: সুলতান ইবনে আব্দুল্লাহ আল-উমরী
অনুবাদ: হুসাইন আহমাদ বিন সাইদুর রহমান*

১. আল্লাহর জন্য তাদের প্রতি ভালোবাসা রাখা। কেননা তারা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্য লাভ করেছেন, দ্বীনকে সাহায্য করেছেন এবং দ্বীনের জন্য আত্মোৎসর্গ করেছেন।

২. তাদের জন্য সন্তুষ্টি প্রকাশ করা এবং তাদের জন্য কল্যাণের দু'আ করা।

৩. তাদের মর্যাদার প্রতি বিশ্বাস রাখা এবং এ বিশ্বাস রাখা যে, তারা নবীদের পর শ্রেষ্ঠ মানুষ। যেমন- হাদীছে এসেছে, خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي 'মানুষদের মধ্যে সর্বোত্তম আমার যুগের লোকেরা'।[৮০]

৪. তাদের সম্পর্কে যেসব কথা বা কাজ বর্ণিত হয়, তা যাচাই-বাছাই করা।

৫. যারা ছাহাবীদের ভালোবাসে, তাদেরকে ভালোবাসা এবং যারা ছাহাবীদের শত্রু মনে করে, তাদের বিরোধিতা করা।

৬. উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ছাহাবীদের জীবনী ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি পাঠ করা। আল্লাহ বলেন, ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ﴾ 'তাদের এ কাহিনীগুলোতে অবশ্যই বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে শিক্ষা' *(ইউসুফ, ১২/১১১)*।

৭. সমাজে ছাহাবীদের জীবনী প্রচার করা এবং মানুষের মাঝে তাদের মর্যাদা ও গুণাবলি তুলে ধরা।

৮. তাদেরকে নিষ্পাপ মনে না করা; বরং তারা মানুষ, তাদের পক্ষেও ভুল হওয়া সম্ভব। হাদীছে এসেছে, كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ 'প্রত্যেক আদম সন্তান ভুল করে, আর সর্বোত্তম ভুলকারী হলো যারা তওবা করে'।[৮১] তবে তারা যেসব ভুল করেছেন, তাদের সৎকর্ম ও ভালো দিকগুলো ভুলের চেয়ে অনেক বেশি ও বড়।

৯. ছাহাবীদের মধ্যে যে মতবিরোধ ও ফেতনা ঘটেছিল, সে বিষয়ে বিতর্কে না জড়ানো।

১০. ছাহাবীদের সম্পর্কে অতিরঞ্জন না করা এবং তাদের প্রকৃত মর্যাদার চেয়ে বেশি উচ্চে তুলে না ধরা।

১১. যারা ছাহাবীদের সম্মানহানি করে বা তাদের মর্যাদা নিয়ে কথা বলে, তাদের কথার জবাব দেওয়া।

১২. ছাহাবীদের গালি না দেওয়া। হাদীছে এসেছে, لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي 'তোমরা আমার ছাহাবীদের গালি দিয়ো না'।[৮২]

১৩. যাদেরকে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন, আমরা তা সাক্ষ্য দেই। যেমন- আবূ বকর, উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা-সহ অন্যান্য ১০ জন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ছাহাবী।

১৪. আমরা বিশ্বাস করি, সকল ছাহাবী ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বাসযোগ্য। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা তোমার হাতে গাছের নিচে বায়আত করেছিল' *(আল-ফাতহ, ৪৮/১৮)*। আর হাদীছে এসেছে, خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي 'মানুষদের মধ্যে সর্বোত্তম আমার যুগের লোকেরা'।[৮৩]

---

৭৯. অধ্যয়নরত, কুল্লিয়্যাহ ২য় বর্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।
৮০. ছহীহ বুখারী, হা/২৬৫২।
৮১. ইবনু মাজাহ, হা/৪২৫১, হাদীছটি ছহীহ।
৮২. ছহীহ বুখারী, হা/৩৬৭৩।
৮৩. ছহীহ বুখারী, হা/২৬৫২।

www.al-itisam.com

ফাযায়েলে আমল

মানবকল্যাণে নেক আমল

-মাহবূবুর রহমান মাদানী (রাজশাহী)*

১. বৃক্ষরোপণকারীর মর্যাদা:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةً.

আনাস ইবনু মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘কোনো মুসলিম যে গাছ লাগায় অথবা ফসল ফলায়, অতঃপর কোনো পাখি অথবা মানুষ অথবা পশু এর থেকে কিছু খায়; তাহলে মালিকের জন্য তা ছাদাক্বা হিসেবে গণ্য হবে’।[৮৫]

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَلَّا تَقُومَ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْرِسَهَا، فَلْيَفْعَلْ.

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘ক্বিয়ামত হয়ে গেলেও তোমাদের কারও হাতে যদি কোনো গাছের চারা থাকে এবং সে তা এর আগেই রোপণ করতে সক্ষম হয়, তবে সে যেন তা রোপণ করে ফেলে’।[৮৬]

শিক্ষা: বৃক্ষরোপণ অত্যন্ত মহৎ কাজ, বিশেষভাবে ফলদায়ক গাছ লাগানো। বৃক্ষরোপণের দ্বারা মানুষ, জীবজন্তু ও পশুপাখি উপকৃত হয়। অতএব, কেউ যদি অল্প কিছু তা হতে খায়, তাহলে মালিকের গালি দেওয়া উচিত নয়; বরং তার উপর কর্তব্য হলো ছওয়াবের আশা করা।

২. সৎকাজে অপরকে উদ্বুদ্ধ করার ছওয়াব:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ.

আবূ মাসঊদ আনছারী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কোনো সৎকাজে অপরকে উদ্বুদ্ধ করে, সেও ততটুকু ছওয়াব পায়, যতটুকু সৎকর্মী পায়’।[৮৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا.

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি কাউকে সৎপথের দিকে ডাকে, তার জন্য সেই পরিমাণ ছওয়াব রয়েছে, যা তার অনুসারীদের জন্য রয়েছে; অথচ এটা তাদের ছওয়াবের কোনো অংশই কমাবে না’।[৮৮]

শিক্ষা: অতএব, সবার কর্তব্য হলো ভালো কাজে অন্যকে সহযোগিতা করা এবং অন্যায় কাজে সহযোগিতা না করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ ‘সৎকাজে ও আল্লাহভীরুতার কাজে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা করো এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না’ *(আল-মায়েদা, ৫/২)*।

৩. ভালো কাজে সুপারিশ করার প্রতিদান:

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا﴾ ‘যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের জন্য সুপারিশ করবে, তার জন্য তাতে ছওয়াবের অংশ আছে। আর যে মন্দ কাজের জন্য সুপারিশ করবে, তার জন্য তাতে পাপের অংশ আছে’ *(আন-নিসা, ৪/৮৫)*।

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَتَاهُ السَّائِلُ أَوْ صَاحِبُ الحَاجَةِ قَالَ اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا وَلْيَقْضِ اللهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَا شَاءَ.

আবূ মূসা রাযিয়াল্লাহু আনহু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, যখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট কোনো ভিক্ষুক বা অভাবী লোক আসত, তখন তিনি ছাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বলতেন, ‘তোমরা সুপারিশ করো বা আবেদন করো, তাহলে তোমাদের সুপারিশের প্রতিদান বা ছওয়াব দেওয়া হবে। আল্লাহ তাআলা যে আদেশ জারি করতে চান, তা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভাষায় জারি করেন’।[৮৯]

শিক্ষা: কেউ যদি কাউকে কোনো ভালো কাজে সহযোগিতা করতে না পারে, তাহলে যে করতে সামর্থ্য রাখে তার কাছে আবেদন করবে বা সুপারিশ করবে। এর বিনিময় সেও পাবে।

---

৮৪. শিক্ষক, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।
৮৫. ছহীহ বুখারী, হা/২৩২০; ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৫৩।
৮৬. মুসনাদে আহমাদ, হা/১২৯৮১; আদাবুল মুফরাদ, হা/৪৭৯, হাদীছ ছহীহ।
৮৭. ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৯৩।
৮৮. ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৭৪।
৮৯. ছহীহ বুখারী, হা/৬০২৭; মিশকাত, হা/৪৯৫৬।

www.al-itisam.com

সুন্নাতের সাথে প্রতিদিন

মসজিদে গমন ও অবস্থানের সুন্নাতসমূহ

-আল-ইতিছাম ডেস্ক

প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায়ের জন্য মানুষ মসজিদে গমন করে। মসজিদে গমন করার কতক বিষয় রয়েছে, যা পালন করা সুন্নাত। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ:

১. মসজিদে আগেভাগে যাওয়া সুন্নাত: আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যদি লোকেরা জানত যে, আযান ও প্রথম কাতারে ছালাত আদায়ে কি নেকী নিহিত রয়েছে, তাহলে তারা পরস্পরে প্রতিযোগিতা করত। তেমনি আগেভাগে জামাআতে শরীক হওয়ার নেকী যদি তারা জানত, তাহলে তারা সেদিকে ছুটে যেত। অনুরূপভাবে যদি তারা জানত এশা ও ফজরের ছালাতে কী নেকী রয়েছে, তবে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও ঐ দুই ছালাতে আসত'।[৯০]

২. ওযূ করে বাড়ি থেকে বের হওয়া, এতে প্রতিটা কদমে ছওয়াব লেখা হয়: আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'কোনো ব্যক্তি ঘরে ও বাজারে (একাকী) ছালাত আদায় অপেক্ষা জামাআতে ছালাত আদায় করলে ২৫ গুণ বেশি ছওয়াব পাবে। কেননা তোমাদের কেউ যখন উত্তমরূপে ওযূ করে শুধু ছালাতের উদ্দেশ্যেই মসজিদে যায় এবং একমাত্র ছালাতই তাকে (ঘর থেকে) বের করে, তাহলে মসজিদে পৌঁছা পর্যন্ত তার প্রতিটি পদক্ষেপে একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং একটি করে গুনাহ ক্ষমা হয়। মসজিদে প্রবেশের করার পর সেখানে যতক্ষণ পর্যন্ত সে ছালাতের জন্য অবস্থান করবে, ততক্ষণ তাকে ছালাতের মধ্যে গণ্য করা হবে। সে যতক্ষণ পর্যন্ত তার ছালাত আদায়ের স্থানে অবস্থান করে, ফেরেশতাগণ তার জন্য এই বলে দু'আ করতে থাকে, হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! তার প্রতি রহম করুন। হে আল্লাহ! তার তওবা কবুল করুন। যতক্ষণ পর্যন্ত সে কাউকে কষ্ট না দেয় অথবা তার ওযূ না ভাঙে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তার জন্য এরূপ দু'আ করতে থাকে'।[৯১]

৩. ছালাতের উদ্দেশ্যে ধীরস্থির ও শান্তভাবে মসজিদে গমন করা: আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন তোমরা ইক্বামত শুনতে পাবে, তখন ছালাতের দিকে চলে আসবে। তোমাদের উচিত ধীরস্থিরতা ও গাম্ভীর্য অবলম্বন করা, তাড়াহুড়া করবে না। ইমামের সাথে যতটুকু পাও, তা আদায় করবে আর যা ছুটে যায়, তা পূর্ণ করবে'।[৯২]

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীছে বর্ণিত 'সাকিনাহ'র সম্পর্ক নড়াচড়ার সাথে অর্থাৎ চলাচল করার ক্ষেত্রে ধীরস্থিরতা ও অনর্থক কথা-কর্ম থেকে বিরত থাকা। হাদীছে বর্ণিত 'ওয়াক্বর' এর সম্পর্ক অবস্থার সাথে। যেমন- দৃষ্টি অবনত রাখা, আওয়াজ নিচু রাখা ও এদিক-সেদিক না তাকানো।[৯৩]

৪. মসজিদে প্রবেশ করার সময় ডান পা আগে ঢুকানো এবং বের হওয়ার সময় বাম পা আগে বের করা: আনাস রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, সুন্নাত হচ্ছে যখন মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন ডান পা আগে ঢুকাবে আর যখন বের হবে, তখন বাম পা আগে বের করবে।[৯৪]

৫. মসজিদে প্রবেশ করার সময় এবং বের হওয়ার সময় দু'আ পাঠ করা: আবূ হুমাইদ বা আবূ উসাইদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বলে,

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাগুলো খুলে দিন। আর বের হওয়ার সময় যেন বলে,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করি'।[৯৫]

৬. মসজিদে প্রবেশ করার পর বসার পূর্বে দুই রাকআত ছালাত আদায় করা: কেউ ছালাতের জন্য আগেভাগে মসজিদে আসলে বসার পূর্বে দুই রাকআত ছালাত আদায় করবে। আবূ ক্বাতাদা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমাদের

৯০. ছহীহ বুখারী, হা/৬১৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৪৩৭।
৯১. ছহীহ মুসলিম, হা/৬৪৯।
৯২. ছহীহ বুখারী, হা/৬৩৬; ছহীহ মুসলিম, হা/৬০২।
৯৩. শারহে মুসলিম লিন নববী, হা/৬০২।
৯৪. মুসতাদরাকে হাকেম, ১/৩৩৮, হাদীছটি মুসলিমের শর্তানুযায়ী ছহীহ।
৯৫. ছহীহ মুসলিম, হা/৭১৩।

www.al-itisam.com

কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে, সে যেন দুই রাকআত ছালাত (তাহিয়্যাতুল মসজিদ) আদায় করার পূর্বে না বসে'।[৯৬]

যে সকল ফরয ছালাতের পূর্বে সুন্নাত রয়েছে, সে সুন্নাতগুলো আদায় করলে তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় হয়ে যাবে। যেমন- ফজর, যোহর বা ইশরাকের সুন্নাত। কেউ যদি মসজিদে প্রবেশ করে ছালাতুল ইশরাক, বিতর বা ফরয ছালাত আদায় করে, তাহলে তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় হয়ে যাবে। কেননা তাহিয়্যাতুল মাসজিদ আদায় করা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ছালাত না পড়ে কেউ বসবে না। এটার রহস্য হচ্ছে, মসজিদ আবাদ হবে ছালাত দিয়ে। ছালাতের উদ্দেশ্য ছাড়া কেউ মসজিদে গমন করবে না।

৭. প্রথম কাতারে শামিল হওয়ার জন্য আগেভাগে গমন করা পুরুষের জন্য সুন্নাত। পুরুষের জন্য প্রথম কাতার সর্বোত্তম আর নারীদের জন্য শেষের কাতার সর্বোত্তম: আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'পুরুষদের জন্য প্রথম কাতার উত্তম এবং শেষের কাতার মন্দ আর মহিলাদের জন্য শেষের কাতার উত্তম এবং প্রথম কাতার মন্দ'।[৯৭]

উত্তম কাতার বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছে, ছওয়াব ও মর্যাদার দিক থেকে বেশি এবং মন্দ কাতার বলতে উদ্দেশ্য হচ্ছে, ছওয়াব ও মর্যাদার দিক থেকে কম।

এই হাদীছটি সে সময় প্রযোজ্য, যখন নারী ও পুরুষ একই জামাআতে ছালাত আদায় করে; অথচ উভয়ের মাঝে কোনো প্রাচীর বা পর্দা থাকে না, এমন পরিস্থিতিতে মহিলাদের জন্য শেষের কাতার উত্তম। কারণ এটা তাদেরকে পুরুষের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে।

যখন উভয়ের মাঝে কোনো বেড়া থাকে, যেমন- প্রাচীর বা পর্দা অথবা অধিকাংশ মসজিদে যেমনটি দেখা যায় যে, নারীদের জন্য আলাদা ছালাতের জায়গা, এমন পরিস্থিতিতে মহিলাদের জন্য প্রথম কাতার উত্তম। এটাই শায়খ ইবনু বায রাহিমাহুল্লাহ ও শায়খ ইবনু উছায়মীন রাহিমাহুল্লাহ-এর অভিমত। কারণ তখন নারীদের পুরুষের নিকটবর্তী হওয়ার সম্ভাবনার কোনো কারণ নেই। আর হুকুম পরিবর্তন হওয়া কারণের উপর নির্ভরশীল। অসংখ্য হাদীছে ব্যাপকার্থে প্রথম কাতারের ফযীলত প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে অন্যতম—

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যদি লোকেরা জানত যে, আযান ও প্রথম কাতারে ছালাত আদায়ে কি নেকী নিহিত রয়েছে, তাহলে তারা পরস্পরে প্রতিযোগিতা করত। তেমনি আগেভাগে জামাআতে শরীক হওয়ার নেকী যদি তারা জানত, তাহলে তারা সেদিকে ছুটে যেত। অনুরূপভাবে যদি তারা জানত এশা ও ফজরের ছালাতে কী নেকী রয়েছে, তবে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও ঐ দুই ছালাতে আসত'।[৯৮]

৮. মুক্তাদীর জন্য ইমামের কাছাকাছি দাঁড়ানো সুন্নাত: মুক্তাদীর জন্য ছালাতে প্রথম কাতারে দাঁড়ানো সর্বোত্তম। সুতরাং সর্বাত্মক চেষ্টা করবে ইমামের কাছাকাছি দাঁড়ানোর। ডান পার্শ্ব বা বাম পার্শ্ব, যেটাই ইমামের নিকটস্থ হবে, সেটাই সর্বোত্তম। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও জ্ঞানী লোকেরা আমার নিকটবর্তী হয়ে দাঁড়াবে...'।[৯৯] আলোচ্য হাদীছে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা 'আমার নিকটবর্তী হয়ে দাঁড়াবে' এটাই প্রমাণ করে যে, ডান বা বাম পার্শ্ব, যেটাই হোক না কেন ইমামের নিকটবর্তী হওয়াই উদ্দেশ্য।

৯৬. ছহীহ বুখারী, হা/১১৬৩; ছহীহ মুসলিম, হা/৭১৪।
৯৭. ছহীহ মুসলিম, হা/৪৪০।
৯৮. ছহীহ বুখারী, হা/৬১৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৪৩৭।
৯৯. ছহীহ মুসলিম, হা/৪৩২।

তীব্র গরমে মুমিনের পরীক্ষার বাকি অংশ

মানুষের কর্ম ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়:

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ 'মানুষের কৃতকর্মের কারণে স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে' *(আর-রূম, ৩০/৪১)*। বর্তমান তাপপ্রবাহের পেছনে পরিবেশ ধ্বংস, গাছ কাটা ও অপচয়ের মতো মানবসৃষ্ট কারণও থাকতে পারে। তাই এটি আমাদের জন্য আত্মসমালোচনার একটি সুযোগ।

আমাদের করণীয়:

তাপপ্রবাহের মতো কঠিন সময়ে আমাদের করণীয়—

১. বেশি বেশি ইস্তিগফার ও তওবা করা।
২. আল্লাহর কাছে রহমত ও বৃষ্টির জন্য দু'আ করা।
৩. পর্যাপ্ত পানি পান করা এবং অন্যদের সাহায্য করা।
৪. অপ্রয়োজনীয় রোদ এড়িয়ে চলা।
৫. গাছ লাগানো এবং পরিবেশ রক্ষা করা।
৬. নিয়মিত ছালাত ও ইবাদতে মনোযোগী হওয়া।

পরিশেষে বলতে চাই, তীব্র গরম ও তাপপ্রবাহ আমাদের জন্য শুধু কষ্টের কারণ নয়; বরং এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা ও বার্তা। কুরআন ও হাদীছ আমাদের শেখায়, প্রতিটি কষ্টের মাঝেই শিক্ষা রয়েছে এবং প্রতিটি পরীক্ষার মধ্যেই রয়েছে কল্যাণের সম্ভাবনা। অতএব, আমাদের উচিত এই তাপপ্রবাহকে ধৈর্য, তওবা ও আত্মশুদ্ধির একটি সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এই পরীক্ষায় সফল হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

www.al-itisam.com

চিন্তাধারা

দুই ঈদের মোহনা: স্মৃতির সেই অমলিন ঘ্রাণ আর আজকের যান্ত্রিক রোশনাই

-আতাউল্লাহ বিন আবুল কালাম আজাদ*

মহান আল্লাহর এই বিশাল সৃষ্টিজগতে সময়ের বিবর্তন আসলে এক মহানিদর্শন। সময়ের আবর্তনে মানুষ বড় হয় এবং তার চারপাশের পরিচিত জগতটাও বদলে যায় চোখের পলকে। আশি বা নব্বই দশকের সেই বহুল আলোচিত সোনালি দিনগুলো সরাসরি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কিন্তু শৈশব থেকেই বড়দের মুখে সেই সময়ের ঈদের যে বর্ণনা আমি শুনেছি, তাতে আমার মনে হয় যে, আমরা আসলে এক অদ্ভুত যান্ত্রিক আধুনিকতার যুগে জন্মেছি। আমাদের এখনকার জীবনে সুযোগ-সুবিধা অনেক থাকলেও হৃদয়ের সেই অকৃত্রিম টানটুকু কোথাও যেন ফিকে হয়ে আসছে। আজ ২০২৬ সালের এই ব্যস্ত নগরে দাঁড়িয়ে, যখন বড়দের স্মৃতির সাথে আজকের ঈদের তুলনা করি, তখন বারবার মনে প্রশ্ন জাগে, আমরা কি কেবল যান্ত্রিক উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে ওপরেই উঠেছি, নাকি উৎসবের সেই আসল আত্মাটুকু কোথাও হারিয়ে ফেলেছি?

১. ঈদুল ফিতর: ধৈর্য ও প্রতীক্ষার এক মাস

বড়দের মুখে শোনা গল্পের মাধ্যমে আমি যখন সেই পুরনো দিনগুলোকে কল্পনা করি, তখন সবার আগে চোখের সামনে ভেসে ওঠে ঈদুল ফিতরের সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষার ছবি। বড়রা বলতেন, তাঁদের সময়ে ঈদের আনন্দ শুরু হতো মূলত ১৫ রামাযানের পর থেকেই। তখন ঈদ মানেই ছিল ধৈর্যের সাথে দীর্ঘ একটি মাস অপেক্ষা করা। আজকের মতো যখন তখন অনলাইনে অর্ডার দেওয়া কিংবা এসির নিচে বসে শপিং মলের চাকচিক্য দেখার সুযোগ তাঁদের ছিল না। আমাদের সময়ে এখন মোবাইল হাতে নিলেই দুনিয়ার সব পোশাক চোখের সামনে চলে আসে, কিন্তু তাঁদের সময় বাবা যখন মাসের মাঝামাঝি কোনো একদিন ঈদের বাজার করে আনতেন, সেটিই ছিল বাড়ির ছোটদের কাছে বছরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দিন। সেই সাদামাটা সুতি কাপড়ের জামার ভাঁজ খুললেই নতুনত্বের এক কড়া ঘ্রাণ নাকে আসত। আব্বুর মুখে শুনেছি, সেই নতুন কাপড়ের ঘ্রাণেই নাকি তাঁদের ঈদের আসল আমেজ শুরু হতো। জামাটি আলমারির সবচেয়ে গভীর কোণে সযত্নে লুকিয়ে রাখা হতো, যাতে কোনো বন্ধু বা ভাই তা আগে না দেখে ফেলে। আজ আমাদের আলমারি ডিজাইনার পোশাকে ঠাসা থাকলেও, সেই একটি নতুন জামার জন্য তীব্র প্রতীক্ষার সুখটুকু আমরা হয়তো বর্তমান যুগে আর সেভাবে অনুভব করতে পারি না।

চাঁদ রাতের সেই অকল্পনীয় রোমাঞ্চের কথা, যা এখন আমাদের কাছে রূপকথার মতো মনে হয়। তখন নাকি রেডিওর নব ঘুরিয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ঘোষণা শোনার জন্য বাড়ির সবাই কান পেতে বসে থাকত। হঠাৎ যখন সেই চিরচেনা গানটি বেজে উঠত, ‘ও মন রমজানের ওই রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ’, তখন নাকি চারপাশ এক ভীষণ খুশিতে ভরে উঠত। পাড়ার সব ছেলেমেয়ে মিলে সরু সুতোর মতো সেই বাঁকা চাঁদ দেখার জন্য বাড়ির ছাদে কিংবা খোলা মাঠে দৌড়াদৌড়ি করত। এখন আমাদের স্মার্টফোনের অ্যাপে চাঁদ দেখার খবর অনেক আগেই চলে আসে, কিন্তু নিজের চোখে সেই বাঁকা চাঁদ দেখার রোমাঞ্চটুকু আজ যান্ত্রিকতায় ঢাকা পড়েছে।

২. ঈদুল আযহা: আনুগত্য ও ত্যাগের মহিমা

এরপর যখন ঈদুল আযহার কথা শুনি, তখন মনে হয়- সেই কুরবানীর ঈদের রূপ বড়দের গল্পে ছিল আরও বেশি মায়াবী এবং ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল। বাবার হাত ধরে সেই কাদামাখা গরু-ছাগলের হাটে যাওয়ার আনন্দটাই ছিল তাঁদের কাছে অন্যরকম। কার গরু কত সুন্দর, কিংবা কে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কত ভালো পশু কিনল, এই নিয়ে পাড়ার মোড়ে মোড়ে চলত নির্মল আলোচনা। পশু বাড়িতে আসার পর থেকে তাকে ঘাস খাওয়ানো কিংবা যত্ন করার মধ্য দিয়ে এক ধরনের মমতা তৈরি হতো। কুরবানীর সকালে যখন সেই পশুকে আল্লাহর রাহে যবেহ করার সময় আসত, তখন মনের কোণে যে সূক্ষ্ম হাহাকার জমা হতো,

১০০. দাওরায়ে হাদীছ ফারেগ, আল-জামি‘আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী

www.al-itisam.com

সেটিই ছিল নিজের প্রিয় জিনিসের মায়া ত্যাগ করে রবের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের আসল শিক্ষা।

কিন্তু আজকের যান্ত্রিক যুগে সেই ত্যাগের পরিবেশ কোথায়? এখন ডিজিটাল হাট থেকে ক্লিক করে গরু কেনা হয় এবং অনেক সময় পশু সরাসরি খামার থেকে কসাইখানায় চলে যায়। বাড়ির আঙিনায় পশুর ডাক আর ত্যাগের সেই পবিত্র আবহাওয়া এখন আর আগের মতো পাওয়া যায় না। কুরবানী এখন অনেকের কাছে কেবল একটি বাৎসরিক আর্থিক লেনদেন, কিংবা সামাজিক মর্যাদা প্রকাশের মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা অত্যন্ত দুঃখজনক।

৩. খাবারের টেবিলে সেই অকৃত্রিম ছোঁয়া:

খাবারের টেবিলের সেই অকৃত্রিম ছোঁয়ার কথা যদি বলি, তবে বড়দের কাছে শোনা সেই খাবারের স্বাদ হয়তো আমরা এখনকার নামিদামি রেস্টুরেন্টে গিয়েও পাব না। আগের সময়ের দুই ঈদেই খাবারের আয়োজন ছিল একেবারেই ঘরোয়া এবং আন্তরিক। ঈদুল ফিতরে মা-চাচিদের হাতে তৈরি সেই হাতে কাটা সেমাই কিংবা ক্ষীরের যে অকৃত্রিম স্বাদ ছিল, তা আজ আধুনিক শেফদের রান্নায় খুঁজে পাওয়া ভার। সারারাত জেগে মশলা বাটা আর উনুনের ধারে বসে রান্নার সেই ব্যস্ততার মধ্যে এক ধরনের পারিবারিক ঐক্য ছিল, যা বর্তমানের অর্ডার করা খাবারে কল্পনাও করা যায় না।

বড়দের মুখে শোনা সেই মেহমানদারির গল্পগুলো আজ আমাদের কাছে আশ্চর্যজনক মনে হয়। তখন নাকি কারো বাড়িতে যাওয়ার জন্য দাওয়াতের প্রয়োজন হতো না। এক বাড়িতে রান্না হলে প্রতিবেশীরা সেখানে অবলীলায় চলে আসত এবং আনন্দের ভাগ নিত। আজ আমরা আভিজাত্য কিংবা প্রাইভেসি রক্ষার দোহাই দিয়ে নিজেদের গেট বন্ধ করে রাখি। সেই মেঠোপথের অকৃত্রিম মেলামেশা আজ নগরের উঁচু ফ্ল্যাটবাড়িতে বন্দি হয়ে গেছে।

৪. ঈদ কার্ড বনাম যান্ত্রিক শুভেচ্ছা:

মনে পড়ে বড়দের বলা সেই রঙিন ঈদ কার্ডের কথা, যা এখন আমাদের কাছে শুধুই ইতিহাস। সামান্য কয়েকটা টাকা জমিয়ে দোকান থেকে বেছে বেছে কার্ড কেনা, আর পরম মমতায় তাতে হাতে লিখে ঈদ মোবারক জানানো, ছিল এক বিশাল আবেগের বিষয়। ডাকপিয়ন যখন সেই কার্ডগুলো বিলি করত, তখন মনে হতো প্রিয় কোনো মানুষের দু'আ সরাসরি হাতে পাওয়া গেল। কার্ডগুলো নাকি বছরের পর বছর বইয়ের ভাঁজে আগলে রাখা হতো।

আজ আমরা হোয়াটসঅ্যাপে একটি কপি-পেস্ট করা মেসেজ বা ফরোয়ার্ড করা ভিডিওর বন্যায় ভেসে যাই। এখানে আন্তরিকতার কোনো অবকাশ নেই এবং নেই কোনো ব্যক্তিগত ছোঁয়া। মেসেজের রিপ্লাই দিতে দিতেই আমাদের ঈদের অনেকটা সময় পার হয়ে যায়। আমরা আসলে এখন মানুষকে হৃদয়ের চেয়ে মোবাইল স্ক্রিনেই বেশি খুঁজি, যা আমাদের একাকিত্ব বাড়িয়ে দিচ্ছে।

৫. নির্মল বিনোদন ও হারানো মেলা:

আগেকার মেলাগুলোর কথাও বড়দের মুখে অনেক শুনেছি। ঈদের দিন বিকেলে পাড়ার খোলা মাঠে ছোটখাটো মেলা বসত, যেখানে নাগরদোলা বা মাটির খেলনা ছিল প্রধান আকর্ষণ। বড়দের কাছ থেকে পাওয়া সালামির সেই সামান্য কয়েকটা টাকা দিয়ে মেলায় গিয়ে যা কেনা হতো, তাতেই ছিল অফুরন্ত তৃপ্তি। আজ সেই নির্মল বিনোদনগুলো হারিয়ে গেছে।

এখনকার তরুণ প্রজন্মের কাছে ঈদ মানে নেটফ্লিক্সে মগ্ন থাকা, কিংবা গেমিং জোনে গিয়ে সময় কাটানো। ডিজিটাল লাইক আর কমেন্টের সংখ্যার ওপর এখন আমাদের ঈদের সার্থকতা নির্ভর করে, যা সত্যিই ভাবনার বিষয়। মানুষের সাথে মানুষের যে সরাসরি আড্ডা আর প্রাণখোলা হাসাহাসি ছিল, তা আজ যান্ত্রিক পর্দার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে।

৬. নাড়ির টান বনাম পর্যটন:

অতীতের ঈদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল নাড়ির টানে বাড়ি ফেরা। যত কষ্টই হোক না কেন, বড়রা গ্রামের টানে ছুটে যেতেন। প্রবীণদের সালাম করা, আর শৈশবের বন্ধুদের সাথে মেঠোপথে আড্ডা দেওয়া ছিল ঈদের আসল প্রাণ। কিন্তু বর্তমানে আমাদের ঝোঁক বদলে গেছে।

এখন আমাদের কাছে ঈদের ছুটি মানেই হলো কোনো পর্যটন স্পটে ঘুরতে যাওয়া। পারিবারিক মিলনমেলার জায়গা দখল

www.al-itisam.com

করেছে বিলাসবহুল ট্যুর। এতে করে আমাদের আত্মীয়তার বন্ধনগুলো দিন দিন শিথিল হয়ে যাচ্ছে। বর্তমান প্রজন্ম তাদের মূল শেকড় ও পারিবারিক ঐতিহ্য সম্পর্কে আগের মতো আর কিছুই জানতে পারছে না। গ্রামে যাওয়ার সেই আনন্দ আর মাটির ঘ্রাণ এখনকার পর্যটন কেন্দ্রের কৃত্রিমতায় খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

৭. সামাজিক বিবর্তন ও বৈষম্য:

অতীতের ঈদে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধানটা অন্তত উৎসবের দিনটিতে ঘুচে যেত। যাকাত আর ফিতরার টাকা পৌঁছে দেওয়া হতো সরাসরি মানুষের হাতে। পাড়ার সচ্ছল পরিবারগুলো খেয়াল রাখত, যেন দরিদ্র শিশুটিও নতুন পোশাক পরে ঈদগাহে আসে। আজ যাকাত হয়ে গেছে অনেক ক্ষেত্রে লোকদেখানো প্রদর্শন, যেখানে মানুষের সম্মানের চেয়ে নিজের প্রচারই বেশি থাকে।

অন্যদিকে সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে এক ধরনের বড়ত্ব প্রকাশের সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। কার পশু কত দামি, বা কার পোশাক কত দামি, এই তথ্যগুলো যখন আমরা প্রচার করি, তখন সামর্থ্যহীনদের মনে হীনম্মন্যতা তৈরি হতে পারে। অতীতের ঈদ ছিল আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার, আর বর্তমানের ঈদ অনেক ক্ষেত্রে হয়েছে আনন্দ দেখানোর।

৮. আধ্যাত্মিকতা ও তাক্বওয়ার গুরুত্ব:

ঈদের যে মূল ধর্মীয় শিক্ষা, অর্থাৎ সংযম এবং তাক্বওয়া, তা যান্ত্রিকতার ভিড়ে আজ যেন কোথাও গৌণ হয়ে যাচ্ছে। ঈদুল ফিতরের ছিয়াম সাধনা আমাদের শিখায় ধৈর্য ও মিতব্যয়িতা। কিন্তু ঈদের দিন আমরা যে পরিমাণ অপচয় করি, তা কি সেই শিক্ষার সাথে একদমই যায়?

একইভাবে ঈদুল আযহায় পশু কুরবানী মানে নিজের ভেতরের অহংকার আর পশুবৃত্তিকে বিসর্জন দেওয়া। কিন্তু আমরা পশুর গলায় ছুরি চালালেও নিজেদের জেদ, হিংসা আর ঘৃণা বিসর্জন দিতে পারছি কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। বর্তমানের আলোকসজ্জার আড়ালে সেই আধ্যাত্মিক প্রশান্তিটুকু খুঁজে পাওয়া আজ আমাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। লোকদেখানো আনুষ্ঠানিকতার চেয়ে মনের পবিত্রতা আজ অনেক বেশি জরুরী।

৯. প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার:

অবশ্যই প্রযুক্তির কিছু ইতিবাচক দিক আছে, যা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। আজ প্রবাসে থাকা প্রিয় মানুষটি ভিডিও কলের মাধ্যমে নিমিষেই পরিবারের সাথে ঈদের আনন্দ ভাগ করে নিতে পারে, যা আমাদের জন্য আল্লাহর এক বড় নেয়ামত। টাকার অভাবে যারা ঈদে বাড়ি যেতে পারে না, তারা অন্তত প্রিয়জনের হাসিটুকু দেখে সান্ত্বনা পায়।

কিন্তু এই প্রযুক্তির অতি ব্যবহার যেন আমাদের সরাসরি সামাজিক মেলামেশার পথে বাধা না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা জরুরী। আমরা এখন একই ঘরে বসে খাবার খাই, কিন্তু সবাই সবার স্মার্টফোনে মগ্ন থাকি। আমাদের শারীরিক উপস্থিতি থাকলেও, মানসিকভাবে আমরা যেন একে অপরের থেকে যোজন যোজন দূরে সরে যাচ্ছি।

১০. উপসংহার: তাক্বওয়া ও মানবিক আগামীর প্রত্যাশায়

আসলে পরিবর্তনই পৃথিবীর নিয়ম এবং একে মেনে নিতেই হবে। তবে আধুনিক হওয়ার মানে এই নয় যে, আমরা আমাদের দ্বীনি মূল্যবোধ আর ঐতিহ্যকে বিসর্জন দেব। বড়দের কাছে শোনা সেই অকৃত্রিম ঈদের গল্পগুলো আমাদের বারবার একটি কথাই শিখিয়ে দেয়, আনন্দ মানে কেবল বস্তুগত ভোগ কিংবা প্রদর্শন নয়, বরং আনন্দ মানে হচ্ছে একে অপরের প্রতি ভালোবাসা আর শ্রদ্ধাবোধ।

এবারের ঈদে আসুন, আমরা অন্তত কিছু সময়ের জন্য এই ডিজিটাল পর্দা থেকে বেরিয়ে আসি। মোবাইলটা একপাশে সরিয়ে রেখে প্রিয়জনের সাথে সরাসরি কথা বলি এবং পাড়া-প্রতিবেশীর খোঁজ নিই। ঈদ মানে তো আসলে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করা এবং আনন্দ সবার মাঝে ভাগ করে নেওয়া। সেই ভাগাভাগিটা হোক হৃদয়ে হৃদয়ে, কোনো সামাজিক মাধ্যমের ওয়ালে নয়।

অতীতের সেই সোনালি ঐতিহ্যগুলো আমাদের জীবনের পাথেয় হয়ে থাকুক। সবাইকে দুই ঈদের অকাল শুভেচ্ছা জানাই। আমাদের উৎসবগুলো আবার তার হারানো মহিমা ও প্রাণ ফিরে পাক প্রতিটি মানুষের অন্তরে। কোনো যান্ত্রিক রোশনাই যেন আমাদের হৃদয়ের সেই অকৃত্রিম আলোকে নিভিয়ে দিতে না পারে।

www.al-itisam.com

হেলথ কর্নার

গরমে জন্ডিস: সচেতনতা হোক সুরক্ষার প্রথম ধাপ

-ডা. মুহাম্মাদ মাহতাব হোসাইন মাজেদ*

প্রখর গ্রীষ্ম মানেই শুধু অস্বস্তি নয়; এটি নানা রোগেরও বাহক। এ সময় ডায়রিয়া, হজমের গোলযোগের পাশাপাশি নীরবে বাড়তে থাকে জন্ডিসের ঝুঁকি। দূষিত পানি, রাস্তার শরবত ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্যগ্রহণের মাধ্যমে এ রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বর্ষা বা বন্যার সময় পানি দূষণ বেড়ে গেলে এই আশঙ্কা আরও গভীর হয়। তাই জন্ডিসকে হালকা করে দেখার কোনো সুযোগ নেই; অবহেলা করলে তা গুরুতর জটিলতায় রূপ নিতে পারে।

জন্ডিস: একটি লক্ষণ, একটি সতর্কবার্তা

জন্ডিস মূলত কোনো স্বতন্ত্র রোগ নয়; বরং শরীরের ভেতরের সমস্যার একটি প্রকাশ। রক্তে বিলিরুবিন নামক রঞ্জকের মাত্রা বেড়ে গেলে ত্বক, চোখ ও প্রস্রাব হলুদ বর্ণ ধারণ করে।

এই অবস্থা তৈরি হয় বিভিন্ন কারণে—রক্তকণিকার অস্বাভাবিক ভাঙন, লিভারের প্রদাহ, অথবা পিত্তনালীর বাধা—সবই জন্ডিসের পেছনে ভূমিকা রাখতে পারে।

কেন বাড়ে ঝুঁকি?

গরমের সময় পানিবাহিত ভাইরাস সহজেই ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে হেপাটাইটিস ‘এ’ ও ‘ই’ ভাইরাস দূষিত পানি ও খাবারের মাধ্যমে সংক্রমণ ঘটায়। এছাড়া—

- লিভারের দীর্ঘমেয়াদি রোগ।
- কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া।
- রক্তজনিত অসুখ।
- ক্যানসার বা জেনেটিক সমস্যা এসব কারণেও জন্ডিস দেখা দিতে পারে।

লক্ষণগুলো চিনে নিন:

জন্ডিস শরীরকে আগে থেকেই সংকেত দেয়—

- চোখ ও ত্বক হলুদ হয়ে যাওয়া।
- প্রস্রাবের রং গাঢ় হওয়া।
- অরুচি, বমি ভাব।
- দুর্বলতা ও জ্বর।
- পেটব্যথা বা চুলকানি।
- পায়খানার রং পরিবর্তন।

কখনো কখনো মারাত্মক লক্ষণও দেখা দিতে পারে, যা অবহেলা করা বিপজ্জনক।

নবজাতকের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা:

জন্মের পর অনেক শিশুরই সাময়িক জন্ডিস হতে পারে, যা সাধারণত স্বাভাবিক। তবে কিছু লক্ষণ দেখা দিলে দেরি না করে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া জরুরী—

- খুব দ্রুত জন্ডিস দেখা দেওয়া।
- দীর্ঘদিন স্থায়ী হওয়া।
- শিশুর খাওয়ার অনীহা বা জ্বর।

এই সময়ে মায়ের দুধই শিশুর জন্য সর্বোত্তম ও অপরিহার্য।

প্রতিরোধ: পরিচ্ছন্নতা ও সংযম

ইসলাম পরিচ্ছন্নতাকে ঈমানের অংশ হিসেবে শিক্ষা দেয়। আর এই পরিচ্ছন্নতাই জন্ডিস প্রতিরোধের মূল চাবিকাঠি। কিছু সহজ অভ্যাস আমাদের সুরক্ষিত রাখতে পারে—

- বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানি পান করা।
- রাস্তার খোলা খাবার ও শরবত পরিহার করা।
- হাত পরিষ্কার রাখা।
- নিরাপদ রক্ত সঞ্চালন নিশ্চিত করা।
- অবৈধ ও অনিরাপদ সম্পর্ক থেকে বিরত থাকা।
- শরীরের ওজন ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা।

জন্ডিসে খাদ্যাভ্যাস:

রোগাক্রান্ত অবস্থায় খাদ্য হতে হবে সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর—

- শস্যজাত খাবার, ডাল, মাছ ও মুরগি।
- তাজা শাকসবজি ও ফল।
- লেবু বা ডাবের পানি।
- পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি।

অন্যদিকে এড়িয়ে চলতে হবে— অতিরিক্ত তেল-মসলা, মিষ্টি, লাল মাংস ও ক্ষতিকর চর্বিযুক্ত খাবার।

শেষকথা:

স্বাস্থ্য আল্লাহর এক মহান নেয়ামত। এর যত্ন নেওয়া আমাদের দায়িত্ব। জন্ডিসের লক্ষণ দেখা দিলে দেরি না করে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা জরুরী। নিজের মনগড়া চিকিৎসা নয়, বরং সচেতনতা, পরিচ্ছন্নতা ও সঠিক জীবনযাপনই হতে পারে সুস্থতার পথ।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সুস্থতা ও নিরাপত্তা দান করুন।

---

১০১. চিকিৎসক, কলাম লেখক ও গবেষক; প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, জাতীয় রোগী কল্যাণ সোসাইটি।

www.al-itisam.com

জামি'আহ পাতা

তাওহীদ বনাম শিরক: ঈমানের মূল চেতনায় সতর্কবার্তা

-আবু সাঈদ সারোয়ার*

সুধী পাঠক! একজন সাধারণ মুসলিম মাত্র এই বিষয়টি জানার কথা যে, শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় অপরাধ। আমরা যে তাওহীদে বিশ্বাস করি, এর বিপরীত হলো শিরক। তাওহীদ হলো আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করা, একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা; পক্ষান্তরে শিরক হলো আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করা। কোনো মুসলিমের অন্তরে তাওহীদ ও শিরকের বিশ্বাস একসাথে থাকতে পারে না। একজন মানুষ সত্যিকারার্থে তাওহীদে বিশ্বাসী হলে সে কখনো শিরকী বিশ্বাস ও কাজকর্মের প্রতি নমনীয়তা ও মুগ্ধতা প্রকাশ করতে পারে না।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে নিজেকে তাওহীদে বিশ্বাসী দাবি করে এমন অনেক নামধারী মুসলিম শিরকী উৎসব অথবা মূর্তিপূজা উপলক্ষ্যে মুশরিকদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। এটা কীভাবে সম্ভব যে একদিকে তারা বিশ্বাস করে আল্লাহ এক, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই; অপরদিকে তারা বহু ইলাহের পূজারিদের শিরকী আচার-অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করছে, তাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে যাচ্ছে? তারা নিজেদের নেতাকর্মীদের মুশরিকদের শিরকী উৎসবে সাহায্য-সহযোগিতা করার নির্দেশ দিচ্ছে, তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে পূজামণ্ডপে উপস্থিত হচ্ছে, নাঊযুবিল্লাহ! কোথায় তাদের ঈমানের গায়রত? কেমন তাদের তাওহীদের বিশ্বাস? তারা কি কখনো তাদের মা-বাবার প্রতি অসম্মানকারীদের শুভেচ্ছা জানাবে? কেউ কি তাদের মা-বোনদের সম্মান লঙ্ঘন করলে তার প্রতি সহানুভূতি দেখাবে? তাহলে তারা কীভাবে মহান রাব্বুল আলামীনের সাথে অংশীদার সাব্যস্তকারীদের প্রতি শুভেচ্ছা জানায়?

শুনুন! হাজারো খুন-ধর্ষণের চেয়েও বড় অপরাধ যেই শিরক, সেই ভরপুর শিরকের আয়োজনে একজন মুসলিম কীভাবে শুভেচ্ছা জানাতে পারে? বস্তুত, এদের অন্তরে যদি আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও আযমতের অনুভূতি থাকত, সত্যিকার অর্থে যদি তারা তাওহীদের বিশ্বাস অন্তরে ধারণ করত; তাহলে কিছুতেই তারা শিরকী উৎসবের প্রতি শুভেচ্ছা জানাতে পারত না এবং মুশরিকদের পূজামণ্ডপে উপস্থিত হতো না। মুশরিকদের প্রতি তাদের ভালোবাসা ও মুগ্ধতা দেখে রাসূল ﷺ-এর সেই কথা স্মরণ হয়, لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيٌّ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، وَحَتَّى تَعْبُدَ فِئَامٌ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ 'আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোক মুশরিকদের সঙ্গে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত এবং আমার উম্মতের কিছু গোত্র মূর্তিপূজায় লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না'।[১০৩]

আমার প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোন! আগে আমরা দেখতাম সেক্যুলার রাজনৈতিক দলের নেতারা এমন ঈমান বিধ্বংসী কাজ করত, কারণ তাদের কাছে ঈমান ও ধর্মীয় মূল্যবোধের কোনো গুরুত্ব নেই; কিন্তু এখন ইসলামের নামে রাজনীতি করা গণতান্ত্রিক দলের নেতাকর্মীরাও শিরকী উৎসব উপলক্ষ্যে মুশরিকদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করবেন না। এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন' *(আন-নিসা, ৪/৪৮)*। আর পবিত্র কুরআনে আরও ইরশাদ হয়েছে, ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ 'নিশ্চয়ই যে আল্লাহর সাথে শিরক করে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য জান্নাত হারাম, তার ঠিকানা জাহান্নাম। আর যালেমদের কোনো সাহায্যকারী নেই' *(আল-মায়েদা, ৫/৭২)*।

শিরক হলো সবচেয়ে বড় যুলম। পবিত্র কুরআনে লুক্বমান হাকীমের উপদেশ উল্লেখ করে শুরুতেই বলা হয়েছে, ﴿يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ 'হে আমার বৎস! আল্লাহর সাথে শিরক করো না; নিশ্চয়ই শিরক বড় যুলম' *(লুক্বমান, ৩১/১৩)*। শিরক সমস্ত আমলকে বিনষ্ট করে দেয়। নবীদের দ্বারা শিরক সংঘটন হওয়া সম্ভবই নয়, তবুও আল্লাহ তাআলা বান্দাদের সতর্ক করার জন্য নবীদের কাছ থেকে উদাহরণ তুলে বলেছেন, যদি তারা শিরক করত; তাহলে তাদের সব কৃতকর্ম বিনষ্ট হয়ে যেত। এমনকি নবী ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেন, ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ 'আপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে, যদি আপনি

১০২. অধ্যয়নরত, কুল্লিয়্যাহ ১ম বর্ষ, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

১০৩. মাজমূ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েল ইবনু উছায়মীন, ৯/৪৭৭।

www.al-itisam.com

আল্লাহর শরীক স্থির করেন; তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন' *(আয-যুমার, ৩৯/৬৫)*।

আমাদের নবী ﷺ শিরকের ভয়াবহতা ও পরিণাম বহু হাদীছে উল্লেখ করে উম্মতকে সতর্ক করেছেন।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمُوجِبَتَانِ فَقَالَ مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ.

জাবের রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! অবধারণকারী দুটি বিষয় কী কী? রাসূল ﷺ বললেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরীক না করা অবস্থায় মারা যায়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরীক না করা অবস্থায় মারা যায়, সে জাহান্নামে যাবে'।[১০৪] এভাবে দুনিয়াতে যত নবী-রাসূল আগমন করেছেন, প্রত্যেকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন এবং কুফর-শিরক থেকে মানুষকে বিরত থাকতে বলেছেন।

কুরআনুল কারীমে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর দু'আ বর্ণিত হয়েছে, ﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানসন্ততির মধ্য থেকে আমাদের জন্য চোখজুড়ানো (নেককার) সাথী দান করুন এবং আমাদেরকে মুত্তাক্বীদের জন্য অনুসরণযোগ্য আদর্শস্বরূপ করুন' *(আল-ফুরক্বান, ২৫/৭৪)*। আর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তার সঙ্গীদের আদর্শের প্রশংসা করে আল্লাহ বলেন, ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْ إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ 'ইবরাহীম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ' *(আল-মুমতাহিনাহ, ৬০/৪)*। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম-এর এই বিশেষ মর্যাদার কারণ হলো শিরকের বিরুদ্ধে তার বলিষ্ঠ অবদান। যখন তিনি তার সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদত কর, তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের প্রত্যাখ্যান করছি। আমাদের আর তোমাদের মাঝে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ শুরু হয়ে গেছে, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।

আজকের প্রেক্ষাপটে এটি আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যে, ইবরাহীমী আদর্শ চায় শিরকের সাথে স্পষ্ট বিচ্ছেদ, তাওহীদে অটল থাকা এবং শিরক ও মুশরিকদের প্রতি কোনো প্রীতিভাব না রাখা। বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, বর্তমানে অনেক আলেম ও ফুক্বাহায়ে কেরাম ফতওয়া দিয়েছেন যে, অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসবে মুসলিমদের শুভেচ্ছা জানানো হারাম এবং মারাত্মক গুনাহ। এমনকি অনেকের মতে, এটা ঈমান বিনষ্টকারী কাজ। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, مَنْ رَضِيَ بِالشِّرْكِ فَهُوَ مُشْرِكٌ 'যে শিরকের প্রতি সন্তুষ্ট হয়, সেও মুশরিক'।[১০৫] ইবনু তায়মিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, কোনো মুসলিমের জন্য কাফেরদের ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানানো জায়েয নয়। কারণ শুভেচ্ছা জানানো মানে তাদের কুফরীকে ও তাদের শিরককে সমর্থন করা'।

একইভাবে মুসলিমদের জন্য কাফের-মুশরিকদের উৎসবে যোগদান করা, তাদেরকে শিরকী কাজে যেকোনোভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করা এবং মূর্তি ও প্রতিমার নামে উৎসর্গকৃত কোনো খাবার গ্রহণ করা বৈধ নয়। উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, তোমরা মুশরিকদের উৎসবের দিন তাদের উপাসনালয়ে প্রবেশ করো না। কেননা তাদের উপর আল্লাহর গযব নাযিল হয়।[১০৬]

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 'সৎকাজ ও তাক্বওয়ার ব্যাপারে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা করো; পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' *(আল-মায়েদা, ৫/২)*। সুতরাং প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোন! আপনি যদি সত্যিকার অর্থে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ কালেমায় বিশ্বাসী হন; তাহলে যাবতীয় শিরকী কার্যক্রম থেকে নিজেকে বাঁচান, শিরকী কাজে সহযোগিতা করা বন্ধ করুন, শিরকী উৎসবে মুশরিকদের শুভেচ্ছা জানানো থেকে বিরত থাকুন, শিরকী উৎসবের প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশ করা এবং শিরককারীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা থেকে দূরে থাকুন। মুশরিকদের সাথে এবং তারা যা কিছুর পূজা করে—এসবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করুন। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তার সঙ্গীদের মতো দীপ্ত ঘোষণায় কণ্ঠ মিলান, ﴿إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ﴾ 'তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যা কিছুর উপাসনা কর তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি এবং আমাদের ও তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য উদ্রেক হলো, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো' *(আল-মুমতাহিনাহ, ৬০/৪)*।

এটাই আমাদের দাবি এবং এটাই আমাদের ঈমানের সুরক্ষা। কোনো রাজনৈতিক সুবিধা, কোনো ভোট, কোনো পশ্চিমাদের স্বার্থ রক্ষা কখনোই তাওহীদের সাথে আপসের অজুহাত হতে পারে না। মুশরিকদের শিরক উৎসবে শরীক হওয়া, তাদেরকে শুভেচ্ছা জানানো কিংবা তাদের শিরককে সমর্থন করা—সবই অনুত্তম ও বিপজ্জনক এবং এক ধরনের আত্মঘাতী কাজ। এগুলো ইসলাম ও তাওহীদের বিরুদ্ধে গৃহীত এক বিকৃত অনুশাসন।

পরিশেষে বলতে চাই, শিরক এমন মহাপাপ যার প্রশ্রয় আমাদের ইসলামী পরিচয়কে থেকে মুছে দেয়। শিরকের বিরুদ্ধে প্রতিটি মুসলিমকে কণ্ঠে-ভঙ্গিতে, কাজে-আচরণে লড়াই করতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন, আমাদেরকে তাওহীদে দৃঢ় রাখুন এবং শিরক ও মুশরিকদের থেকে আমাদের রক্ষা করুন- আমীন!

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ، وَنَجِّنَا مِنَ الشِّرْكِ وَمِنْ أَهْلِهِ. آمِين

১০৪. ছহীহ মুসলিম, হা/৯৩।

১০৫. তাফসীরে কুরতুবী, ৮/৯৪।

১০৬. বিস্তারিত দেখুন: 'ইকতিযাউস ছিরাতিল মুস্তাক্বীম' গ্রন্থ।

www.al-itisam.com

কবিতা

এলো ঈদুল আযাহা

রমজান বিন শামসুল
খাগুরিয়া, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

এলো ঈদুল আযাহা,
মনে আনন্দের ছোঁয়া।দেব পশু কুরবানী
কুরআনেরই পবিত্র বাণী।
এলো ইবরাহীমি সুন্নাহ,
গগনে কুরবানীর আবহ।
দিল থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টিতে,
সুন্নাহ হোক কবুল খাঁটি নিয়্যতে।
গরীব, দুঃখী, মিসকীন, প্রতিবেশী
বণ্টনের আনন্দে করি তাদেরও অংশী।
উৎসবের পুলকে আমরা সবাই,
ভালোবাসার রঙে দিনটি সাজাই।

জীবন ব্যাকরণ

-নিশাত তাসনিম তুবা
৯ম শ্রেণি, জামি'আহ সালাফিয়্যাহ, রাজশাহী।

ভাবছ তুমি জীবন নিয়ে
করছ সমর কত,
ফিলিস্তীনের অবুঝ শিশু
মরছে শত শত।
লড়ছ তুমি জীবনযুদ্ধে,
হতেই হবে জয়ী!
তাকিয়ে দেখো মাইল স্টোনের
দহন রক্তক্ষয়ী।
প্রাণ গেল কত নিরীহ শিশুর
মান গেল হায় দেশের,
তবুও তোমার জীবন নিয়ে,
এত যাতনা কীসের?
জীবন নামের ছলনা ভুলে
তুমি মরণকে করো স্মরণ,
যুগ যুগ ধরে চলতে থাকবে
এই জীবন ব্যাকরণ।

ঈদের স্বাদ

-সাদিয়া আফরোজ
শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

চুক্তি ভঙ্গ গাযার মাঝে
দৃষ্টি পড়ে যখন,
ঈদের স্বাদ হারিয়ে ফেলি
অশ্রু ঝরে তখন।
গোটা মুসলিম উম্মাহ যখন
ঈদকে নিয়ে ব্যস্ত,
গাযার শিশু রক্তস্নাত
করছে না কেউ হস্ত।
কেমন করে ঈদের স্বাদ ভাই
ভারাক্রান্ত প্রাণ পায়?
খাবার বিনে গাযায় দেখ
কত শত প্রাণ যায়।
গাযার বুকে আসবে কবে
ঈদের মহা খুশি?

অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি

-বাসসাম ইবনে আব্দুল আলীম
৭ম শ্রেণি, আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

প্রতিটি প্রহর যেন একখানা অলিখিত পাতা,
প্রতিটি শ্বাস, প্রতিটি কাজ আমারই আমলনামা।
সাদা পাতায় জমছে কত কালির কালো দাগ,
কখনো পুণ্য, কখনো-বা জমছে পাপের ভাগ।
ভেবেছি অনেক অবসরে বসে করব সম্পাদনা,
ভুলগুলো কেটে ঠিক করে নেব, ছিল মনে বাসনা।
কিন্তু হঠাৎ মৃত্যু এসে ফুরাবে কালির আয়ু,
থামবে কলম, থেমে যাবে শ্বাসপ্রশ্বাস বায়ু।
হাশরের দিন খুলবে যখন আমার সে বইখানি,
লজ্জায় আমি নত হব ঝরবে চোখের পানি।
দয়াময় প্রভু! রহম দিয়ে মুছে দিও সব ভুল,
উতরে আমি যেতে পারি যেন ছিরাতের সেই পুল।

www.al-itisam.com

সংবাদ

বাংলাদেশ সংবাদ

হামের ভয়াবহ প্রাদুর্ভাব: দেড় মাসে ২৭৩ জনের মৃত্যু, আক্রান্ত হাজারো শিশু

দেশে হাম পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ১৫ মার্চ থেকে ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত হাম ও এর উপসর্গ নিয়ে মোট ২৭৩ জন প্রাণ হারিয়েছেন। এর মধ্যে ৪৭ জনের মৃত্যু ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় নিশ্চিত হওয়া গেছে, আর বাকি ২২৬ জন হামের উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন। এই দেড় মাসে মোট ৩৪ হাজার ৬৬২ জন শিশু হামের উপসর্গ নিয়ে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছে, যার মধ্যে ৪ হাজার ৮৫৬ জনের শরীরে ল্যাব পরীক্ষার মাধ্যমে হাম শনাক্ত হয়েছে। সংক্রমণের তীব্রতা সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে ঢাকা বিভাগে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) বাংলাদেশের এই পরিস্থিতিকে 'উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। কারণ দেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৫৮টিতেই এই রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। আক্রান্তদের বড় অংশই ৫ বছরের কম বয়সী শিশু।

২২ হাজার রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশি পাসপোর্ট প্রদান: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

সউদী আরবে অবস্থানরত ২২ হাজার রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশি পাসপোর্ট প্রদান করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। ২০ এপ্রিল ২০২৬, সোমবার সচিবালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত সউদী রাষ্ট্রদূত ড. আব্দুল্লাহ জাফর বিন আবিয়াহর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে মন্ত্রী সাংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, সউদী আরবে প্রায় ৬৯ হাজার মিয়ানমারের নাগরিক (রোহিঙ্গা) রয়েছেন যারা নবায়নযোগ্য পাসপোর্ট ছাড়াই সেখানে অবস্থান করছেন। মূলত ১৯৭০-এর দশকে তারা বাংলাদেশি পাসপোর্ট নিয়ে সউদ আরবে গিয়েছিলেন। দীর্ঘ সময় পার হওয়ার পর তাদের পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় তারা আইনি জটিলতায় পড়েন। সউদ সরকারের অনুরোধ ও দ্বিপাক্ষিক সমঝোতার ভিত্তিতে মানবিক দিক বিবেচনা করে এই পাসপোর্ট দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মন্ত্রী বলেন, 'ইতোমধ্যেই ২২ হাজার রোহিঙ্গাকে যাচাই-বাছাই শেষে পাসপোর্ট ও প্রয়োজনীয় ট্রাভেল ডকুমেন্ট প্রদান করা হয়েছে। বাকিদের নাগরিকত্ব এবং পূর্ববর্তী নথিপত্র পরীক্ষা করে পর্যায়ক্রমে পাসপোর্ট দেওয়া হবে'। এই প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে বাংলাদেশ থেকে একটি বিশেষ বিশেষজ্ঞ দল বর্তমানে সউদ আরবে অবস্থান করছে।

আন্তর্জাতিক বিশ্ব

লেবাননে গাযার মতো 'ইয়েলো লাইন' তৈরির কথা জানালো ইসরাঈল

ইসরাঈলি বাহিনী দক্ষিণ লেবাননে গাযা উপত্যকার আদলে 'ইয়েলো লাইন' (হলুদ রেখা) নামে একটি সামরিক সীমারেখা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছে। এই সীমারেখাটি লিতানি নদীর দক্ষিণে ৩ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীর একটি বাফার জোন হিসেবে কাজ করবে। ইসরাঈলের দাবি, যুদ্ধবিরতি চলাকালেও সীমান্ত এলাকায় হিজবুল্লাহর সম্ভাব্য হুমকি মোকাবিলায় এই রেখা কার্যকর থাকবে। তবে অভিযোগ উঠেছে যে, গাযার মতো এখানেও বাড়িঘর ধ্বংস ও বাসিন্দাদের নিজ গ্রামে ফিরতে বাধা দিয়ে এলাকাটি জনশূন্য করার কৌশল নিয়েছে ইসরাঈল। এই পদক্ষেপকে লেবানন সরকার ও হিজবুল্লাহ সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন এবং ছদ্মবেশী দখলদারিত্ব হিসেবে অভিহিত করেছে।

www.al-itisam.com

মুসলিম বিশ্ব

ফিলিস্তীনিদের বাস্তুচ্যুত করতে যৌন নির্যাতনকে হাতিয়ার করেছে ইসরাঈল

অধিকৃত পশ্চিম তীরে ফিলিস্তীনিদের তাদের পৈতৃক ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করতে ইসরাঈলি সেনা ও বসতি স্থাপনকারীরা পরিকল্পিতভাবে যৌন নির্যাতন ও লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। সম্প্রতি মানবাধিকার সংস্থা ও আইন বিশেষজ্ঞদের এক যৌথ গবেষণা প্রতিবেদনে এই ভয়াবহ তথ্য উঠে এসেছে। গবেষণায় দেখা গেছে, ফিলিস্তীনি পরিবারগুলোকে আতঙ্কিত করতে এবং তাদের এলাকা ছাড়তে বাধ্য করতে ফিলিস্তীনিদের বাস্তুচ্যুত করতে যৌন নির্যাতনকে হাতিয়ার করেছে ইসরাঈল এমন কৌশল বেছে নেওয়া হয়েছে। ভুক্তভোগীদের বর্ণনায় উঠে এসেছে জোরপূর্বক নগ্ন করা, প্রহার, নগ্ন অবস্থায় ছবি তুলে ছড়িয়ে দেওয়া এবং ধর্ষণের হুমকির মতো চরম অপমানজনক ঘটনার কথা। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের লক্ষ্য করে চালানো এই সহিংসতা অনেক পরিবারকে নিরাপত্তাহীনতার কারণে ঘরবাড়ি ছাড়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করছে। অনেক ক্ষেত্রে ইসরাঈলি বাহিনীর উপস্থিতিতেই বসতি স্থাপনকারীরা এসব হামলা চালায়, যা পরিস্থিতিকে আরও উদ্বেগজনক করে তুলেছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এই ধরনের কার্যক্রমকে জেনেভা কনভেনশনের লঙ্ঘন ও যুদ্ধাপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

সাইন্স ওয়ার্ল্ড

পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনের যুগে পা রাখছে বাংলাদেশ

পদ্মাপারের রূপপুরে এক নতুন ইতিহাসের সূচনা হয়েছে। গত ২৮ এপ্রিল, ২০২৬ ইং, রোজ মঙ্গলবার বিকেলে দেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রথম ইউনিটে আনুষ্ঠানিকভাবে জ্বালানি বা ইউরেনিয়াম লোডিং শুরু হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী দেশগুলোর অভিজাত ক্লাবে ৩৩তম সদস্য হিসেবে সগৌরবে নাম লেখালো বাংলাদেশ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় এবং রাশিয়ার কারিগরি সহায়তায় বাস্তবায়িত এই প্রকল্পের জ্বালানি লোডিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, চুল্লিপাত্রে ১৬৩টি ফুয়েল অ্যাসেম্বলি স্থাপনের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। লোডিং প্রক্রিয়া শেষে শুরু হবে কারিগরি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণাধীন ফিশন বিক্রিয়া, যা বৈজ্ঞানিক ভাষায় 'ফার্স্ট ক্রিটিকালিটি' নামে পরিচিত। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সব পরীক্ষা সফলভাবে সম্পন্ন হলে আগামী আগস্ট নাগাদ পরীক্ষামূলকভাবে ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হতে পারে। ২০২৭ সালের শুরুর দিকে প্রথম ইউনিটটি ১২০০ মেগাওয়াট পূর্ণ ক্ষমতায় বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। ১২.৬৫ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে নির্মিত এই মেগা প্রকল্প দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি কার্বন নিঃসরণমুক্ত টেকসই উন্নয়নের পথে এক বিশাল পদক্ষেপ।

দাওয়াত সংবাদ

বেলাল ইবনে রাবাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) কুরআন ও দ্বীন শিক্ষা : ব্যাচ নং- ১১

দ্বীন শিখতে আগ্রহী জেনারেল শিক্ষিত ভাইদের জন্য সালাফী শায়খদের নিবিড় তত্ত্বাবধানে থেকে দ্বীন শিক্ষার এক সুবর্ণ সুযোগ তৈরি করেছে 'আদ-দাওয়া ইলাল্লহ'। গত গত ২৫শে এপ্রিল, ২০২৬ খ্রি. থেকে ১৪ই মে, ২০২৬ খ্রি. পর্যন্ত বিভিন্ন জেলা থেকে আগত জ্ঞানপিপাসু দ্বীনি ভাইয়েরা 'আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, রাজশাহীতে একত্রিত হয়ে একটানা '২০ দিন মেয়াদী' বাংলাদেশের বিদগ্ধ উলামায়ে দ্বীনের সান্নিধ্যে থেকে হাতে-কলমে সঠিক দ্বীনের জ্ঞান, আক্বীদা-আমল, আদব-তারবিয়াত শিখেন। শবগুজারীর মাধ্যমে ইবাদতে অভ্যস্ত হন। নির্দিষ্ট সিলেবাস ও রুটিন মাফিক কোর্সটি বিনামূল্যে তারা গ্রহণ করেন। কোর্সে বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এতে ১৫ জন দ্বীনী ভাই অংশগ্রহণ করেন। 'নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর অধীন পরিচালিত 'আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ' এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। এতে প্রশিক্ষক ছিলেন আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ-এর শিক্ষক ও আদ-দাওয়াহ ইলাল্লহ-এর দাঈগণ— আব্দুর রাযাযাক বিন ইউসুফ, মাহবুবুর রহমান মাদানী, আব্দুল আহাদ স্যার, শহীদুল্লাহ কাসেমী মাদানী, আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক, হাফেয শহীদুল ইসলাম, মুসলেহউদ্দিন বিন সিরাজুল ইসলাম, মুহাম্মাদ আল-ফিরোজ, আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ প্রমুখ বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

উক্ত কোর্সের একটি গুরুত্বপূর্ণ আকর্ষণ ছিল ছালাতের প্র্যাকটিক্যাল প্রশিক্ষণ, যা মাহবুবুর রহমান মাদানী প্রদান করেন। এই প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণার্থীগণ অতি স্বাচ্ছন্দ্যে গ্রহণ করেন এবং উপকৃত হন। কোর্স শেষে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন ও যাচাই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং মেধাতালিকা তথা প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান নির্ধারণ করা হয়। সকল প্রশিক্ষণার্থী ও মেধাতালিকার প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারীদের মাঝে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট প্রদানের মাধ্যমে কোর্সটির সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। পুরস্কার ও সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠানে আব্দুর রহমান বিন আব্দুর রাযযাক উপস্থিত ছিলেন।

www.al-itisam.com

সওয়াল-জওয়াব

আক্বীদা

প্রশ্ন (১): কেউ যদি কাউকে হত্যা করে অথবা চুরি, ডাকাতিসহ যেকোনো খারাপ কাজ করে বলে, এটা তার তাকদীরে লেখা আছে বিধায় করছে- এমন বলা বা বিশ্বাস করা যাবে কি?

-মো. রুবেল মীর
হিলি, হাকিমপুর, দিনাজপুর।

উত্তর: না, এমন বিশ্বাস রাখা যাবে না। এটা ভ্রান্ত জাবারিয়া সম্পদায়ের আক্বীদা। তারা বান্দার ইচ্ছাশক্তিকে অস্বীকার করে। তারা বিশ্বাস করে, মানুষ যা কিছু করে বা যা ঘটে এতে মানুষের কোনো ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নেই। এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা হলেন জা'দ বিন দিরহাম। এক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের বিশ্বাস হলো বান্দার কর্মের স্বাধীনতা রয়েছে, সৎকর্ম করলে তাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে আর অসৎকর্ম করলে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'অচিরেই মুশরিকরা বলবে, আল্লাহ যদি চাইতেন, আমরা শিরক করতাম না এবং আমাদের পিতৃপুরুষরাও না এবং আমরা কোনো কিছু হারাম করতাম না। এভাবেই তাদের পূর্ববর্তীরা মিথ্যারোপ করেছে, যে পর্যন্ত না তারা আমার আযাব আস্বাদন করেছে। বলো, তোমাদের কাছে কি কোনো জ্ঞান আছে, যা তোমরা আমাদের জন্য প্রকাশ করবে? তোমরা তো শুধু ধারণার অনুসরণ করছ এবং তোমরা তো কেবল অনুমান করছ' *(আল-আনআম, ৬/১৪৮)*। তিনি আরও বলেন, 'অবশ্যই আমি তাকে পথ প্রদর্শন করেছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে অথবা অকৃতজ্ঞ হবে' *(আদ-দাহর, ৭৬/৩)*।

প্রশ্ন (২): আমরা আল্লাহকে সিজদা করি, নাকি আল্লাহর জন্য সিজদা করি? কেননা একজন শায়খ বলেছেন, যারা আল্লাহকে সিজদা করে তারা কাফের।

-মো. রাজু আহমেদ
বেনুঘাট, চওড়ার হাট, মহানগর রংপুর।

উত্তর: আল্লাহকে সিজদা করা এবং আল্লাহর জন্য সিজদা করা একই বিষয়। কেননা কুরআন ও হাদীছে যেসব জায়গায় আল্লাহকে সিজদার কথা এসেছে, সেসব জায়গায় আল্লাহকে সিজদা করা যাবে না আর আল্লাহর জন্য সিজদা করতে হবে- এমন কোনো পৃথক বিবরণ নেই। বরং ইবাদতের সময় আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছি এমন একাগ্রতা নিয়েই ইবাদত করতে হবে মর্মে প্রমাণ পাওয়া যায়। রাসূল ﷺ বলেন, 'তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর তুমি যদি তাকে নাও দেখ, তিনি তোমাকে অবশ্যই দেখছেন' *(ছহীহ বুখারী, হা/৫০; মুসলিম, হা/১)*।

প্রশ্ন (৩): দাজ্জাল এখন কোথায় আছে? যদি পৃথিবীতে থাকে, তাহলে বর্তমান প্রযুক্তির যুগেও আমরা তাকে দেখতে পাই না কেন? দলীল ও যুক্তির আলোকে জানাবেন।

-সিবগাতুল্লাহ
খুলনা।

উত্তর: দাজ্জাল লোহার শিকলে বন্দি অবস্থায় পৃথিবীর কোনো অজানা দ্বীপে রয়েছে। আল্লাহর অনুমতি না আসা পর্যন্ত বের হতে পারবে না *(ছহীহ মুসলিম, হা/২৯৪২)*। দাজ্জালের অবস্থান গায়েবের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ জানেন না। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তিনি গায়েব জানেন, কাউকে তা প্রকাশ করেন না' *(আল-জিন, ৭২/২৬)*। তথ্যপ্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তি শুধু দাজ্জালের বিষয় নয়, বরং অনেক বিষয় কভার করতে পারে না। যেমন- জিন, ফেরেশতা, মানুষের অন্তরের খবর, সপ্ত আকাশ, সাত যমিন ইত্যাদি।

প্রশ্ন (৪): রাষ্ট্রের চাকরি করার জন্য কেউ যদি শহীদ মিনার অথবা স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায়, তাহলে তার কী ধরনের পাপ হবে? সে কি মুশরিক হয়ে যাবে?

-শরীফ আহমেদ
সিরাজগঞ্জ।

উত্তর: প্রথমত, মৃত ব্যক্তির স্মরণে মিনার বা স্তম্ভ নির্মাণ শিরকের অন্যতম উৎস। নূহ আলাইহিস সালাম -এর যুগে কতিপয় নেককার বান্দা ছিলেন। তারা যখন ইন্তিকাল করলেন, তখন শয়তানের

www.al-itisam.com

প্ররোচনায় কিছু লোক তাদের স্মরণে প্রত্যেকের নামে আলাদা করে স্তম্ভ নির্মাণ করল। এরপর লোকেরা তাদের পূজা করা শুরু করল *(তাফসীরে ইবনু কাছীর, ৮/২৪৮)*। সুতরাং মিনার বা স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হারাম, কারণ তা শিরকের দিকে ধাবিত করে। আর যদি কেউ এই স্তম্ভগুলোকে বরকতপূর্ণ মনে করে অথবা বরকত লাভের আশায় ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায়, তাহলে এটা সরাসরি শিরক হবে *(তিরমিযী, হা/২১৮০)*। এছাড়াও মিনার বা স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো একটি বিজাতীয় সংস্কৃতি। রাসূল ﷺ বলেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ‘যে ব্যক্তি কোনো জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত’ *(আবূ দাঊদ, হা/৪০৩১)*। দ্বিতীয়ত, আল্লাহর অবাধ্য হয়ে কোনো মানুষের আনুগত্য করা জায়েয নয়। রাসূল ﷺ বলেন, ‘কোনো আনুগত্য নেই গুনাহের কাজে, আনুগত্য হবে শুধু ভালো কাজে’ *(ছহীহ বুখারী, হা/৭২৫৭)*। সুতরাং উক্ত হারাম কাজে কারো আনুগত্য করা জায়েয নয়।

প্রশ্ন (৫): জনৈক ব্যক্তি হিন্দুদের মণ্ডপে গিয়ে অভিনন্দন জানায় এবং তাদের পূজায় তৈরিকৃত খাদ্য, যেমন- নাড়ু, মিষ্টি ইত্যাদি খায়। ওই ব্যক্তির কি ঈমান আছে বা ওই ব্যক্তির পিছনে কি ছালাত হবে?

-কবিরুল ফরাজী
গোপালগঞ্জ।

উত্তর: হিন্দুদের পূজামণ্ডপে গমন, তাদেরকে অভিবাদন জানানো, তাদের পূজায় তৈরিকৃত খাদ্য গ্রহণ করা ও পূজা সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যক্রম শিরকের অন্তর্ভুক্ত। যারা এগুলো করে তারা শিরকী কাজে অংশগ্রহণ করে। কেননা ধর্মীয় বিষয়ে আপস বা মিশ্রণ নেই। ছাবিত ইবনু দাহহাক রাযিয়াল্লা-হু আনহু সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এক ব্যক্তি মানত করে যে, সে বুওয়ানা নামক স্থানে একটি উট যবেহ করবে। সে নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, আমি বুওয়ানা নামক স্থানে একটি উট কুরবানী করার মানত করেছি। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘সেখানে কি জাহেলী যুগের কোনো মূর্তি রয়েছে?’ লোকেরা বলল, না। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, ‘সেখানে কি তাদের কোনো মেলা বসত?’ লোকেরা বলল, না। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘তাহলে তোমার মানত পূর্ণ করতে পার’ *(আবূ দাঊদ, হা/৩৩১৩)*। হাদীছে এসেছে, আগের যুগে দুজন মুসলিম একটি মূর্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। তখন সেখানকার খাদেমরা বলল, তোমরা একটা মাছি হলেও এখানে দান করে যাও। প্রথমজন দিল এবং তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো; কিন্তু দ্বিতীয়জন বলল, আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে দান করব না, তখন তাকে তারা হত্যা করল এবং লোকটি জান্নাতী হলো’ *(ইবনু আবী শায়বা, হা/৩৩০৩৮; শুআবুল ঈমান, হা/৭৩৪৩)*। তবে এসব কারণে কেউ দ্বীন থেকে বের হয়ে তথা মুরতাদ হয়ে যায় না। মুরতাদ হওয়ার জন্য মৌখিক অস্বীকার করা জরুরী, যেমন- সরাসরি মূর্তির পূজা করা, ইসলামকে অস্বীকার করা ইত্যাদি। সুতরাং উক্ত ব্যক্তির পিছনে ছালাত আদায় করা যায়। তবে সবসময় তাক্বওয়াবান ব্যক্তিকে ইমাম নিযুক্ত করা উচিত। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘তারা তোমাদের ইমামতি করবে; যদি তারা ঠিক করে, তাহলে তোমাদের ও তাদের জন্য ছওয়াব; আর যদি ভুল করে, তাহলে তোমাদের জন্য ছওয়াব, তাদের উপর দায়’ *(ছহীহ বুখারী, হা/৬৯৪)*।

প্রশ্ন (৬): মানুষ হিজড়া কেন হয়? তাদের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীছে কী বলা আছে? তাদের কি পুরুষ হিসেবে বিবেচনা করা হবে, নাকি নারী হিসেবে?

-খবিরুল ইসলাম
রাজশাহী।

উত্তর: ক. হিজড়া আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যেমন ইচ্ছা তেমন সৃষ্টি করেন। হিজড়া সৃষ্টির আসল রহস্য একমাত্র তিনিই জানেন। তবে কোনো ত্রুটি বা অপূর্ণতাসহ যখন তিনি কাউকে সৃষ্টি করেন, তখন তাঁর উদ্দেশ্য হয় পরীক্ষা করা। এক্ষেত্রে বান্দার করণীয় হলো ছবর করা, আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকা এবং যথাযথভাবে তাঁর নির্দেশ পালন করা *(আল-বাকারা, ২/১৫৫)*। খ. কুরআনুল কারীমে হিজড়াদের ব্যাপারে সরাসরি কিছু বলা হয়নি। কারণ শারীরিক গঠন ভিন্ন হলেও বিধানগতভাবে তারা পুরুষ বা নারীদের আওতাভুক্ত। সুতরাং কুরআনুল কারীমে বর্ণিত নারী-পুরুষের বিধানসমূহ তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে আলী রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, যদি সে (হিজড়া) পুরুষাঙ্গ দিয়ে প্রস্রাব করে, তাহলে তাকে পুরুষ বিবেচনা করা হবে; আর যদি স্ত্রীলিঙ্গের পথ দিয়ে প্রস্রাব করে, তাহলে তাকে নারী বিবেচনা করা হবে’ *(বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা, হা/১২৫১৫)*। অর্থাৎ বায়োলজিক্যালি যার মধ্যে পুরুষ হরমোন বেশি হবে সে পুরুষ আর যার মাঝে নারী হরমোন বেশি হবে সে নারী।

www.al-itisam.com

প্রশ্ন (৭): কবরের পাশে গিয়ে মৃত ব্যক্তিকে সালাম দিলে বা দু'আ করলে মৃত ব্যক্তি কি জানতে পারে যে আমার সন্তান বা আত্মীয় আমাকে দেখতে এসেছে বা দু'আ করছে?

-সোহেল
সৈয়দপুর, নীলফামারী।

উত্তর: কবরবাসীরা আগত ব্যক্তির ব্যাপারে জানতে পারে বা তার সালামের উত্তর দেয় মর্মে এমন কোনো আয়াত বা ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে সুন্নত হলো কবর যিয়ারত করা, তাদেরকে সালাম দেওয়া এবং তাদের জন্য দু'আ করা। উল্লেখ্য, কেউ কবরবাসীকে সালাম দিলে তাদের রূহ ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং তারা উত্তর দেয় মর্মে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ *(আল-ইসতিযকার, ১/১৮৫; সিলসিলা যঈফা, হা/৪৪৯৩)*।

প্রশ্ন (৮): দুজন লোক পানিতে ডুবে মারা গেল। একজন দ্বীনদার, ছালাত আদায় করে, ভালো কাজ করে; অন্যজন এমন নয়। তাহলে দুজনেই কি শহীদ? নাকি তাদের মাঝে পার্থক্য আছে?

-সাফওয়ান
নীলফামারী।

উত্তর: রাসূল ﷺ ডুবে মারা যাওয়া ব্যক্তিকে শহীদ বলেছেন। যারা পানিতে ডুবে মারা যায় তাদের দোষত্রুটি খোঁজার প্রয়োজন নেই। তাদের ঈমানী বিষয়টি আল্লাহ তাআলার হাতে। তবে যারা ছালাতকে অস্বীকার করে তাদের বিষয়টি ভিন্ন। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'শহীদ পাঁচ প্রকার- (১) মহামারীতে (প্লেগে) মৃত্যুবরণকারী, (২) পেটের রোগে মৃত্যুবরণকারী, (৩) পানিতে ডুবে মারা যায় যে, (৪) ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে যে মারা যায় এবং (৫) আল্লাহর পথে শহীদ' *(ছহীহ বুখারী, হা/৬৫২)*।

প্রশ্ন (৯): কোনো ব্যক্তি জেনেশুনে বারবার কাবীরা গুনাহ করে, যেমন- যেনা। সে মনে করে আর করবে না, কিন্তু বের হয়ে আসতে পারে না। এ ব্যক্তির শাস্তি কি চিরস্থায়ী জাহান্নাম? তার করণীয় কী?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: প্রথমত, ব্যভিচার করা জঘন্য অপরাধ, যা ইসলামে হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا 'আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং নিকৃষ্ট পথ' *(বনী ইসরাঈল, ১৭/৩২)*। কোন হারাম কাজকে হালাল মনে করে করলে কুফর সাব্যস্ত হয় এবং এর শাস্তি চিরস্থায়ী জাহান্নাম। সুতরাং হালাল মনে করে যেনা করলে কুফর সাব্যস্ত হবে এবং তওবা না করে মৃত্যুবরণ করলে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হতে হবে। পক্ষান্তরে যদি হারাম জেনেই ব্যভিচার করে, তাহলে কুফর সাব্যস্ত হবে না; তবে কাবীরা গুনাহ হবে, আর এ অবস্থায় মারা গেলে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। আবূ যার রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, 'আমার উম্মতের যে ব্যক্তি শিরক না করে মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'। (আবূ যার রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন) আমি জিজ্ঞেস করলাম, যদি সে ব্যভিচার করে এবং চুরি করে? তিনি (রাসূল ﷺ) বললেন, 'যদিও সে ব্যভিচার করে এবং চুরি করে' *(ছহীহ বুখারী, হা/ ১২৩৭)*। দ্বিতীয়ত, ব্যভিচার থেকে ফিরে আসার ক্ষেত্রে করণীয় হলো বিশুদ্ধ তওবা করে দ্বীনের পথে ফিরে আসা এবং যেসব কাজ ব্যভিচারের দিকে ধাবিত করে সেসব কাজ হতে বিরত থাকা। যেকোনো অশ্লীল কথা, কাজ, ছবি, ভিডিও ইত্যাদি থেকে দূরে থাকা। এছাড়া অসৎসঙ্গ ত্যাগ করা, নিয়মিত জামাআতের সাথে ছালাত আদায় করা, অধিক পরিমাণে নফল ছিয়াম রাখা এবং ব্যভিচারের ভয়াবহতা সংক্রান্ত হাদীছগুলো সবসময় স্মরণ করা।

পবিত্রতা

প্রশ্ন (১০): শুনেছি, কাপড় বা চাদরে বীর্য লাগলে তিনবার ধৌত করতে হয়। কিন্তু ভেজা চাদর ভারী হওয়ায় হাতে নিয়ে নিংড়াতে গেলে কোমরে ব্যথা করে এবং বারবার নিংড়াতে গেলে হাতে চাপ পড়ে। এমতাবস্থায় একবার ধৌত করা যথেষ্ট হবে কি? আর বীর্য লাগার পর শুকিয়ে যাওয়ার কারণে তা বের করা না গেলে করণীয় কী?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: কাপড় বা চাদরে বীর্য লাগলে তিনবার ধৌত করার বিষয়ে শ্রুত কথাটি সঠিক নয়। কাপড় বা চাদর ভেজা দেখা গেলে শুধু ভেজা জায়গাটি একবার ধৌত করলেই যথেষ্ট হবে। একদিন জনৈক ব্যক্তি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা-এর ঘরে মেহমান হলো। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা দেখলেন, ভোরে সে তার কাপড় ধৌত করছে (অর্থাৎ রাত্রে তার স্বপ্নদোষ হয়েছিল)। তা দেখে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা ছিদ্দীক্বা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বললেন, মূলত তোমার পক্ষে এটুকুই যথেষ্ট হতো যে, তুমি বীর্য দেখে থাকলে কেবলমাত্র সে স্থানটি ধুয়ে নিতে। আর যদি তা না দেখে থাক, তাহলে জায়গাটিতে পানি ছিটিয়ে নিতে পারতে। কেননা এমনও হয়েছে আমি নিজে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় থেকে শুকনো

www.al-itisam.com

বীর্য রগড়িয়ে ফেলেছি, আর তিনি সে কাপড় পরেই ছালাত আদায় করেছেন *(ছহীহ মুসলিম, হা/২৮৮; আবূ দাঊদ, হা/৩৭১)*। বীর্য শুকনো থাকলে নখ দিয়ে খুচিয়ে তুলে দিলেই তা যথেষ্ট হবে *(ছহীহ মুসলিম, হা/২৯০)*।

প্রশ্ন (১১): কোনো ব্যক্তি মাঝে মাঝে যাতে ওযূ করতে না হয় এজন্য পেশাব-পায়খানা চেপে রাখে। ছালাত আদায় করে প্রয়োজন পূরণে করে। শীতকালে বেশি এমন করে। এভাবে ওযূর ভয়ে পেশাব-পায়খানা চেপে রাখা যাবে কি?

-বাশার আলী
রাজশাহী।

উত্তর: না, পেশাব-পায়খানা চেপে রাখা যাবে না, এমনকি ছালাতের মাঝে হলেও। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা বলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেন, ‘খাদ্য উপস্থিত থাকলে কোনো ছালাত নেই এবং পেশাব-পায়খানার চাপ থাকলে কোনো ছালাত নেই’ *(ছহীহ মুসলিম, হা/৫৬০; মিশকাত, হা/১০৫৭)*। বিশেষ করে শীতকালে ওযূ করার ভয়ে এমন করা আরো গর্হিত কাজ। কেননা রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘আমি কি তোমাদের বলব না, আল্লাহ তাআলা যা দিয়ে গুনাহ মুছে দেন এবং মর্যাদা বাড়িয়ে দেন?’ ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! হ্যাঁ। তিনি বললেন, ‘কষ্ট সত্ত্বেও ভালোভাবে ওযূ করা’ *(তিরমিযী, হা/৫১)*। তিনি আরও বলেন, ‘যে ব্যক্তি ওযূ করে এবং উত্তমভাবে ওযূ করে, তার শরীর হতে তার সকল গুনাহ বের হয়ে যায়, এমনকি তার নখের নিচ হতেও তা বের হয়ে যায়’ *(ছহীহ মুসলিম, হা/২৪৫)*।

ছালাত

প্রশ্ন (১২): আমার মেয়ের বয়স ৪ মাস। বাচ্চা ঘন ঘন প্রস্রাব করার কারণে সুবিধার জন্য ছালাত জমা করে আদায় করতে পারব কি?

-উম্মে আয়মান
পলাশী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর: বাচ্চার ঘন ঘন প্রস্রাবের কারণে ছালাত জমা করা যাবে না। কেননা শারঈ কারণ, যেমন- সফর, বৃষ্টি ছাড়া ছালাত জমা করা যায় না। সময়মতো ছালাত আদায় করতে আল্লাহ নির্দেশ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, ‘নির্ধারিত সময়ে ছালাত কায়েম করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য’ *(আন-নিসা, ৪/১০৩)*। অতএব, প্রস্রাবের জায়গাটুকু ধুয়ে নিয়ে সময়মতো ছালাত আদায়ের চেষ্টা করতে হবে।

প্রশ্ন (১৩): ক্লাস বা এমন জায়গায় যদি সিজদার আয়াত আসে যেখানে মাটিতে সিজদা দেওয়া সম্ভব নয়, তখন কী করবে? পরে কি সিজদা দেওয়া যাবে?

-যুলফিকার
বগুড়া।

উত্তর: সিজদার জন্য উপযুক্ত স্থান না পেলে কিছু সময় বিলম্ব করে উপযুক্ত স্থানে সিজদা আদায় করা যাবে *(আল-মাজমূ‘ লিন-নববী, ৪/৭১)*।

প্রশ্ন (১৪): মসজিদে জায়গা না হওয়ায় জুমআর দিন অল্প কিছু সময়ের জন্য রাস্তার কিছু অংশ বা পুরোটা বন্ধ করে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-ছবিরুল ইসলাম
মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর: রাস্তায় চলাচল করা মানুষের হক্ব। এজন্য রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাস্তায় বসতে নিষেধ করেছেন *(ছহীহ বুখারী, হা/২৪৬৫)*। তবে যদি অপারগ হয়ে বসতেই হয়, তাহলে তিনি রাস্তার হক্ব আদায় করতে বলেছেন। এই হক্বসমূহের মধ্যে একটি হলো রাস্তায় কাউকে কষ্ট না দেওয়া *(ছহীহ বুখারী, হা/২৪৬৫)*। এ হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, সাধারণ অবস্থায় রাস্তায় ছালাত আদায় করা জায়েয নয়। যদি মসজিদে স্থান সংকুলান না হওয়ায় বাধ্য হয়ে রাস্তায় দাঁড়াতে হয়, তাহলে পুরো রাস্তা বন্ধ না করে তাৎক্ষণিক কিছু অংশ ফাঁকা রাখা আবশ্যক, যাতে কোনো পথিক কষ্ট না পায়।

দান-ছাদাকা-যাকাত

প্রশ্ন (১৫): আমি যদি আমার কোনো বন্ধুকে কোনো হালাল জিনিস (হাদিয়া) উপহার দেই, তাহলে সেটা কি দান হিসেবে গণ্য হবে? আমি কি দান এর ছওয়াব পাব?

-নাজমুস সাকিব
জামালপুর।

উত্তর: হাদিয়া ও দান বা ছাদাকা এক জিনিস নয়। হাদিয়া সাধারণত সম্মান করা ও ভালোবাসা প্রকাশ করার জন্য দেওয়া হয়। আর ছাদাকা সাধারণত ফকির-মিসকীনকে দেওয়া হয়। যেমন- রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে হাদিয়া পেশ করা হলে তিনি আগ্রহ সহকারে হাত বাড়িয়ে নিতেন আর ছাদাকা বা দানের ব্যাপারে তিনি বলেছেন, ‘তা হলো মানুষের ময়লা, যা মুহাম্মাদ,

www.al-itisam.com

তাঁর পরিবার বা তাঁর দাসদাসীর জন্যও হালাল নয়' *(ছহীহ মুসলিম, হা/২৩৭২)*। হাদিয়াতে অব্যশই ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ, বন্ধুত্ব, সহমর্মিতা প্রকাশ পায় আর ছাদাকায় অসহায় মানুষকে সাহায্য করা হয়। সুতরাং ছাদাকা আর হাদিয়া এক জিনিস নয়। হাদিয়াতে দানের ছওয়াব পাওয়া যাবে না।

বিধি-বিধান

প্রশ্ন (১৬): যেকোনো পণ্য মজুদ করার বিধান কী এবং এর শাস্তি কী? যেমন- বর্তমানে অনেকে তেল মজুত করছে।

-মতিউর রহমান
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর: কৃত্রিম সংকট তৈরির উদ্দেশ্যে পণ্য মজুত করা নাজায়েয। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতীক্ষায় যে পণ্য মজুদ করে রাখে এবং তা উচ্চ মূল্যে বিক্রি করে সেই প্রকৃত মজুতদার। মামার ইবনু আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লা-হু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'পাপিষ্ঠ লোক ব্যতীত কেউ মজুতদারি করে না' *(ছহীহ মুসলিম, হা/১৬০৫)*। মজুতদার যালেম। কেননা মানুষের তীব্র প্রয়োজনের সময় তা বিক্রি করতে অস্বীকার করা তাদের হক্ক থেকে বঞ্চিত করার মতো। আর উপযুক্ত ব্যক্তিকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যুলম। সুতরাং এর জন্য মজুতদার অবশ্যই শাস্তির সম্মুখীন হবে।

প্রশ্ন (১৭): আমাদের এদিকে অধিকাংশ বিয়ের বাড়িতে চেয়ার-টেবিল বসিয়ে টাকা বা উপহার তোলা হয়। এভাবে টাকা তোলার ব্যাপারে ইসলামের বিধান কী?

-কোবাদ
রংপুর।

উত্তর: বিয়ে উপলক্ষে ইসলামে ওয়ালীমার বিধান রয়েছে। কিন্তু ওয়ালীমার দাওয়াতে অংশগ্রহণকারীদের থেকে উপহার সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে চেয়ার-টেবিল নিয়ে বসে যাওয়া ইসলামে অনুমোদিত নয়, বরং এগুলো কুসংস্কার। এমন প্রয়াস নিম্ন মানসিকতা ও রুচির দুর্ভিক্ষের পরিচয় বহন করে। কোনো সভ্য ও ভদ্র মানুষ দাওয়াতী মেহমানদের থেকে উপহার সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে চেয়ার পেতে বসতে পারে না। অনেক সময় আগত মেহমানরা বাধ্য হয়ে উপহার প্রদান করে। তাই এগুলো বন্ধ করতে হবে। হাদীছে এসেছে, রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'খবরদার! কোনো ব্যক্তির জন্য তার ভাইয়ের সম্পদ হালাল নয়, তবে সেই সম্পদ (হালাল), যা সে সন্তুষ্টচিত্তে প্রদান করে' *(মুসনাদে আহমাদ, হা/১৫৪৮৮)*।

প্রশ্ন (১৮): রক্তদান করার ব্যাপারে ইসলামের বিধান কী? এটা কি ছওয়াবের কাজ?

-জাকিরুল ইসলাম
দিনাজপুর।

উত্তর: প্রথমত, রক্তদানের অর্থ হলো একটি মানবদেহের প্রবাহিত রক্ত সংগ্রহ করে আরেক মানবদেহে তা প্রবেশ করানো। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রবাহিত রক্ত হারাম এবং নাপাক *(আল-আনআম, ৬/১৪৫)*। হারাম বা নাপাক বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করা শুধুমাত্র অপারগ অবস্থায় জায়েয *(আল-আনআম, ৬/১১৯)*। যদি অভিজ্ঞ ডাক্তার নিশ্চিত করেন যে, রক্তদান ব্যতীত রোগীর চিকিৎসা সম্ভব নয়, তাহলে রক্তদাতার ক্ষতি না হওয়ার শর্তে রক্তদান জায়েয। তবে রক্ত বিক্রি করা যাবে না। বিক্রি করলে গুনাহ হবে। রক্ত স্বেচ্ছায় নেকী মনে করে দান করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়ো না' *(আল-বাকারা, ২/১৯৫)*। দ্বিতীয়ত, উল্লিখিত শর্ত মেনে রক্তদান করা ছাওয়াবের কাজ। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা ভালো এবং তাক্বওয়ার কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো' *(আল-মায়েদা, ৫/২)*।

প্রশ্ন (১৯): গুমের ব্যাপারে ইসলাম কী বলে? কেউ গুম করলে তার শাস্তি কী?

-সাদিক
পাবনা।

উত্তর: গুম এমন একটি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড যা মানুষের জীবন, সম্মান ও নিরাপত্তার সরাসরি লঙ্ঘন। তা ইসলামে হারাম ও গুরুতর অপরাধ। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করে কোনো প্রাণের বদলে বা পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়ানো ছাড়া, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করল' *(আল-মায়েদা, ৫/৩২)*। তিনি আরও বলেন, 'আর যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে কষ্ট দেয় যা তারা করেনি তার জন্য, নিশ্চয় তারা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করল' *(আল-আহযাব, ৩৩/৫৮)*। প্রত্যেক মুসলিমের উপর অন্য মুসলিমের জন্য হারাম তার রক্ত, সম্পদ ও সম্মান *(ছহীহ মুসলিম, হা/২৫৬৪)*। গুম নামক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের শাস্তি হচ্ছে হত্যা করা বা ক্রুশবিদ্ধ করা বা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় তাদের শাস্তি কেবল এটাই যে,

www.al-itisam.com

তাদেরকে হত্যা করা হবে বা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে বা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে বা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও আখেরাতে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে' *(আল-মায়েদা, ৩৩/৩৩)*।

প্রশ্ন (২০): কারো নামে সম্পদ দখলের মিথ্যা অপবাদ দিলে এবং মামলা করলে ইসলামে তার কোনো শাস্তির বিধান আছে কি?

-গোলাম কিবরিয়া
রাজবাড়ী।

উত্তর: ইসলামে কারো নামে সম্পদ দখলের মিথ্যা অপবাদ দেওয়া এবং মামলা করা জঘন্য পাপ। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে কষ্ট দেয়, যা তারা করেনি তার জন্য। নিশ্চয় তারা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করল' *(আল-আহযাব, ৩৩/৫৮)*। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়াসাল্লাম -কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের ব্যাপারে এমন কিছু বলে, যা তার মধ্যে নেই (অর্থাৎ মিথ্যা অপবাদ দেয়), আল্লাহ তাকে 'রাদগতুল খাবাল' (পুঁজ ও নোংরা পদার্থের স্থান)-এ অবস্থান করাবেন, যতক্ষণ না সে তার কথার ফল ভোগ করে আর সে সেখান থেকে সহজে বের হতে পারবে না' *(আবূ দাঊদ, হা/৩৬৯৭)*। সম্পদ দখলের মিথ্যা অপবাদের নির্দিষ্ট কোনো শাস্তি শরীআতে নির্ধারিত নেই, তবে বিচারক (কাযী/রাষ্ট্র) তা'যীর হিসেবে পরিস্থিতি অনুযায়ী শাস্তি দিবেন।

প্রশ্ন (২১): কোনো এক সম্মানিত ব্যক্তির সাথে ১/২ ঘণ্টা পর পর কয়েকবার সাক্ষাৎ হয়। আমি প্রথমবার সালাম দেই। আর পরে কখনো দেই, কখনো দেই না। আমার প্রশ্ন জাগে, আমার কি যতবার দেখা হবে ততবার সালাম দিতে হবে?

-জহিরুল ইসলাম
ঢাকা।

উত্তর: যতবারই হোক পুনরায় সাক্ষাৎ হলে সালাম দেওয়াই উত্তম। কেননা আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যখন তার ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, তখন সে যেন তাকে সালাম দেয়। অতঃপর দুজনের মাঝে যদি গাছ, দেয়াল বা পাথর আড়াল হয়ে যায় এবং তারপর আবার সাক্ষাৎ হয়, তাহলেও যেন তাকে সালাম দেয়' *(আবূ দাঊদ, হা/৫২০০)*। তাই দিনে কয়েকবার সাক্ষাৎ হলেও উভয়ের সালাম বিনিময় করা উচিত।

প্রশ্ন (২২): আনন্দ ভ্রমণ সম্পর্কে ইসলাম কী বলে?

-এস. এম. আকাইদ অংকন
রূপনগর আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২১৬।

উত্তর: আল্লাহ তাআলার বিভিন্ন ধরনের সৃষ্টি সরাসরি দেখে ঈমান বৃদ্ধি করা অথবা আল্লাহর অবাধ্যতার পরিণতি দেখে শিক্ষা গ্রহণ করার নিয়্যতে ভ্রমণ করা যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'বলুন, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো এবং অনুধাবন করো, কীভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন! এরপর আল্লাহ সৃষ্টি করবেন পরবর্তী সৃষ্টি। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান' *(আল-আনকাবূত, ২৯/২০)*। আরেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো, অপরাধীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল?' *(আন-নামল, ২৭/৬৯)*। তবে দ্বীনী বা দুনিয়াবী প্রয়োজন ব্যতীত কাফেরদের অঞ্চলে বা প্রকাশ্যে গুনাহের কাজ হয় এমন স্থানে ভ্রমণ করা উচিত নয় এবং বিনোদন, আনন্দ-উল্লাস, অশ্লীলতা, আড্ডা দেওয়া, অযথা ছবি তোলা এগুলো ইসলাম সমর্থন করে না।

প্রশ্ন (২৩): জিহাদ কখন কাদের উপর ফরয হয়? বিভিন্ন দেশে মুসলিমদের নির্যাতন করা হচ্ছে। এতে কি বাংলাদেশ বা ভারতের মুসলিমদের উপর জিহাদ করা ফরয হবে?

-আসমান শাহ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর: জিহাদ অর্থ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। পারিভাষিক অর্থে, আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। ইবনু হাজার বলেন, নফস, শয়তান ও ফাসিকদের বিরুদ্ধে জিহাদও এর অন্তর্ভুক্ত *(ফাতহুল বারী, ৬/৫ পৃ.)*। কাফেরের বিরুদ্ধে জিহাদ প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয, চাই সেটা হাত দিয়ে হোক বা যবান দিয়ে হোক বা মাল দিয়ে হোক কিংবা অন্তর দিয়ে হোক *(ফাতহুল বারী, হা/২৮২৫-এর ব্যাখ্যা, ৬/৪৫ পৃ.)*। জিহাদ ফরয হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত শর্তসমূহ থাকতে হবে- (১) ইসলাম, বালেগ ও সুস্থ বুদ্ধি *(আবূ দাঊদ, হা/৪৪০৩)*। (২) পুরুষ হওয়া *(ছহীহ বুখারী, হা/১৫২০)*। (৩) স্বাধীনতা, দাসের উপর (জিহাদ) ফরয নয়, তবে তার মালিকের অনুমতি থাকলে ব্যতিক্রম। (৪) শারীরিক ও আর্থিক সক্ষমতা থাকা *(আত-তাওবা, ৯/৯১)*। (৫) পিতা-মাতার অনুমতি থাকা *(ছহীহ বুখারী, হা/৩০০৪)*। (৬) শাসক/নেতার অনুমতি থাকা। শরীআতসম্মত জিহাদ কেবল বৈধ শাসক বা মুসলিম নেতৃত্বের অধীনে হবে, যাতে শৃঙ্খলা বজায় থাকে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না

www.al-itisam.com

হয় *(ছহীহ বুখারী, হা/২৯৫৭; ছহীহ মুসলিম, হা/১৮৩৫)*। তবে কিছু ক্ষেত্রে জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। যেমন- (১) মুসলিমদের বাড়িতে বা শহরে শত্রুবাহিনী উপস্থিত হলে *(আত-তাওবা, ৯/১২৩)*। (২) শাসক যখন কাউকে যুদ্ধে বের হওয়ার নির্দেশ দেন *(ছহীহ বুখারী, হা/২৭১৫; ছহীহ মুসলিম, হা/৩৮১৮)*। (৩) যুদ্ধের সারিতে উপস্থিত হলে *(আল-আনফাল, ৮/১৫, ৪৫)*। (৪) যখন কেউ বাধ্য হয় *(তিরমিযী, হা/১৪২১)*।

জায়েয-নাজায়েয

প্রশ্ন (২৪): অর্গান ডোনেশন (অঙ্গ দান) করা কি জায়েয?

-ডালিম
বরিশাল।

উত্তর: মানুষ তার অঙ্গ-প্রতঙ্গের প্রকৃত মালিক নয়। তাই অর্গান ডোনেশন (অঙ্গ দান) জায়েয নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আর অবশ্যই আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি’ *(আল-ইসরা, ১৭/৭০)*। মানুষের শরীর সম্মানিত, তা কাটাছেঁড়া করা অসম্মানের শামিল। তিনি বলেন, ‘আর তোমরা স্বহস্তে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ো না’ *(আল-বাকারা, ২/১৯৫)*। তবে যেসব অঙ্গ দান করলে দাতার কোনো ক্ষতি হয় না, যেমন- লিভার। পুনরায় পরিপূর্ণ হয়ে যায় একরম অঙ্গ দান জীবদ্দশায় করা যায়। আর মৃত্যুর পর সকল অঙ্গ দান করা হারাম। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লা-হু আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াও যাবে না এবং অন্যের ক্ষতি করাও যাবে না’ (ইবনু মাজাহ, হা/২৩৪১)।

প্রশ্ন (২৫): হিন্দুদের মেলায় ব্যবসা করার জন্য কোনো মুসলিম দোকান দিতে পারবে কি?

-খাইরুল মোল্লা
বগুড়া।

উত্তর: বিধর্মীদের মেলায় ব্যবসা করা বৈধ নয়। এতে বিধর্মীদের সহযোগিতা করা হয়। আর আল্লাহ তাআলা অন্যায় ও পাপ কাজে সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছেন *(আল-মায়েদা, ৫/২)*।

প্রশ্ন (২৬): কাউকে খুশি করার জন্য মিথ্যা প্রশংসা করা যাবে কি? যেমন- দোকানে কাস্টমারকে কোনো পোশাকে সুন্দর বলা, অফিসের বসের প্রশংসা বা স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রশংসা করা?

-যুবায়ের রহমান
শরীয়তপুর।

উত্তর: কারো সম্মুখে তার মাঝে বিদ্যমান গুণের প্রশংসা করা নিন্দনীয়, নিষিদ্ধ এবং তাকে ধ্বংস করার নামান্তর *(ছহীহ বুখারী, হা/৯৪৬, ৯৪৭; ছহীহ মুসলিম, হা/৩০০১, ৩০০২)*। আর কাউকে খুশি করার জন্য মিথ্যা প্রশংসা করা প্রতারণা, হারাম ও কাবীরা গুনাহ এর অন্তর্ভুক্ত *(ছহীহ মুসলিম, হা/১০৬)*। সুতরাং দোকানে কাস্টমারকে খুশি করার জন্য বা অফিসের বসের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মিথ্যা প্রশংসা করা হারাম। তবে স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য মিথ্যা প্রশংসা করা জায়েয। ইবনু শিহাব রহিমাহুল্লাহ বলেন, তিনটি স্থান ছাড়া আর কোনো বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিথ্যা বলার অনুমতি দিয়েছেন বলে আমি শুনিনি। যুদ্ধকৌশলের ক্ষেত্রে, মানুষের মধ্যে আপস-মীমাংসা করার জন্য, সহধর্মিণীর সাথে স্বামীর কথা এবং স্বামীর সাথে সহধর্মিণীর কথা বলার ক্ষেত্রে *(ছহীহ মুসলিম, হা/২৬০৫)*।

প্রশ্ন (২৭): শিক্ষা অর্জন বা জানার জন্য অন্য ধর্মগ্রন্থ পড়া যাবে কি? যেমন- বাইবেল, বেদ, তাওরাত।

-ওলিউল্লাহ
ময়মনসিংহ।

উত্তর: আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীম নাযিল করেছেন এবং এটাকে সংরক্ষণ করার ওয়াদা করেছেন। তিনি বলেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ‘নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণকারী’ *(আল-হিজর, ১৫/০৯)*। পক্ষান্তরে তিনি অন্যান্য আসমানী কিতাব সংরক্ষণের ওয়াদা করেননি। ফলে সেসব কিতাবের অনুসারীরা সেই কিতাবগুলো বিকৃত করেছে। কুরআনুল কারীমের একাধিক আয়াতে তাদের এই বিকৃতির কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এসব কিতাব থেকে শিক্ষা অর্জন তো দূরের কথা, বরং ঈমানী বিচ্যুতি ঘটার প্রবল আশঙ্কা থাকে। এজন্য সাধারণ মুসলিমের জন্য এসব কিতাব অধ্যয়ন করা জায়েয নয়। উমার ইবনুল খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লা-হু আনহু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে তাওরাত কিতাবের একটি পাণ্ডুলিপি এনে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা হলো তাওরাতের একটি পাণ্ডুলিপি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ থাকলেন। এরপর উমার রাযিয়াল্লা-হু আনহু তাওরাত পড়তে আরম্ভ করলেন। (এদিকে রাগে) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা বিবর্ণ হতে লাগল। আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু আনহু বললেন, উমার! তোমার সর্বনাশ হোক। তুমি কি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিবর্ণ চেহারা দেখছ না? *(মুসনাদে দারেমী, হা/৪৪৯)*। শুধুমাত্র বিদগ্ধ আলেমগণ ইসলামের সত্যতা ও বিজাতীয় ধর্মগ্রন্থের ভুল-ভ্রান্তি প্রকাশের নিয়্যতে এসব কিতাব অধ্যয়ন করতে পারেন *(ফাতহুল বারী, ১৩/৫২৫-৫২৬)*।

www.al-itisam.com

প্রশ্ন (২৮): কেউ যদি আমাকে কোনো কাজে সাহায্য করে। যেমন- চাকরি পেতে সহযোগিতা, স্কুলে ভর্তি করাতে সহযোগিতা। তাহলে তাকে কি খুশি হয়ে আমি কিছু দিতে পারব?

-আয়েশা জান্নাত
কুষ্টিয়া।

উত্তর: কোনো ব্যক্তির পক্ষে সুপারিশ করে দেওয়ার কারণে তার কাছ থেকে কোনো প্রকার উপহার, সুবিধা বা প্রতিদান গ্রহণ করা ঘুষ হিসেবে গণ্য হবে। আবূ উমামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘কোনো ব্যক্তি তার কোনো ভাইয়ের জন্য কোনো বিষয়ে সুপারিশ করার কারণে যদি সে তাকে কিছু উপহার দেয় এবং সে তা গ্রহণ করে, তাহলে সে সূদের একটি বড় দরজা দিয়ে প্রবেশ করল’ *(আবূ দাঊদ, হা/৩৫৪১)*। আব্দুল্লাহ বিন আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুষদাতা এবং ঘুষগ্রহীতার উপর অভিসম্পাত করেছেন *(আবূ দাঊদ, হা/৩৫৮০)*।

প্রশ্ন (২৯): ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে বিড়াল কেনা-বেচা করা যাবে কি? এব্যপারে ইসলাম কী বলে?

-সোহানা আক্তার
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

উত্তর: বিড়ালকে ব্যবসায়িক পণ্য বানিয়ে কেনা-বেচা করা যাবে না। কেননা এটি আমাদের চারপাশে ঘোরাঘুরি করা একটি প্রাণী। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিড়াল কেনা-বেচা করতে নিষেধ করেছেন। আবূ যুবাইর বলেন, আমি জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর নিকট কুকুর ও বিড়াল কেনাবেচা করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে ধমক দিয়েছেন *(ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৬৯; আবূ দাঊদ, হা/৩৪৭৯)*।

প্রশ্ন (৩০): ফ্রেশি ফ্রাম উগান্ডা ৫,০০০ একর জমিতে একটি কৃষি প্রজেক্ট শুরু করেছে—১,০০০ একর ক্রয় এবং ৪,০০০ একর ২৫ বছরের জন্য লিজ নেওয়া। এখানে গরু, দুম্বা, মাছ, কফি, ড্রাগন ফল, সানফ্লাওয়ারসহ বিভিন্ন চাষাবাদ করা হবে। মোট ১৫,০০০ শেয়ার, প্রতি শেয়ার ১,০০০ ডলার। চাষাবাদ না থাকায় প্রথম ৩ বছর কোনো রিটার্ন নেই, এরপর লাভ শেয়ার হবে (কোম্পানি ৫০%, শেয়ারহোল্ডার ৫০%)। প্রশ্ন হলো, আমি ২টি শেয়ার নিয়েছি—এই বিনিয়োগের শারঈ বিধান কী? এবং এতে যাকাত কীভাবে নির্ধারিত হবে?

-আরিফ মুন্না
ঢাকা।

উত্তর: ক. প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী উক্ত বিনিয়োগ জায়েয *(ছহীহ বুখারী, হা/২৪৮৭)*। খ. উক্ত দুটি শেয়ার প্রশ্নকর্তার মূলধন। এই মূলধনের মূল্য যাকাতের নিসাব পরিমাণ হলে এবং তার উপর এক বছর অতিবাহিত হলে তার উপর যাকাত ফরয। নিসাব ঠিক থাকার শর্তে প্রতি বছর যাকাত আদায় করা আবশ্যক। এতে লভ্যাংশ আসলে নিসাবের সাথে তা মিলিয়ে যাকাত দিতে হবে *(আবূ দাঊদ, হা/১৫৭৩)*।

প্রশ্ন (৩১): আমাদের গ্রামের লোকজন টাকা তুলে ৭-৮ বছর আগে গোরস্থানের চারপাশে কিছু গাছ লাগায়। এখন ঐ সমস্ত গাছ বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে কি মসজিদ মেরামতের কাজ করা যাবে?

-মো. রফিকউজ্জামান
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর: গোরস্থানের চারপাশে লাগানো গাছগুলো যদি গোরস্থানের জন্য ওয়াকফ করা হয়, তাহলে এই গাছগুলোর বিক্রয়মূল্য গোরস্থানের কল্যাণে ব্যয় করা আবশ্যক। আর যদি শুধু গোরস্থানের জন্য ওয়াকফ না হয়; বরং যেকোনো নেকীর কাজে ব্যবহার করার শর্তে গোরস্থান কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে গাছগুলো লাগানো হয়, তাহলে সেই গাছগুলোর বিক্রয়মূল্য মসজিদ মেরামতসহ যেকোনো নেকীর কাজে ব্যবহার করা যাবে *(আল মুগনী, ৬/২৮-৩০)*।

প্রশ্ন (৩২): ক্রেতা ‘ডিসকাউন্ট’ এর বিজ্ঞাপন দেখে পণ্য ক্রয় করতে আসলে তার কাছে আসল দামে বা বেশি দামে পণ্য বিক্রি করলে কি প্রতারণা হবে? ক্রেতা তো সম্মতিতেই পণ্য কিনছেন।

-রায়হান
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর: মূল্যছাড়ের বিজ্ঞাপন দেওয়ার পর বিক্রেতার জন্য আবশ্যক হলো সাধারণ বাজারমূল্য থেকে এই পরিমাণ মূল্য বাদ দিয়ে পণ্য বিক্রি করা, যা সে বিজ্ঞাপনে প্রচার করেছে। যদি সে তা না করে সাধারণ বাজারমূল্য বা তারচেয়ে বেশি মূল্যে পণ্য বিক্রি করে, তাহলে সে প্রতারক বিবেচিত হবে। ইসলামে প্রতারণা হারাম। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, من غشنا فليس منا ‘যে আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়’ *(ছহীহ মুসলিম, হা/১০১)*। উল্লেখ্য, ডিসকাউন্ট বা মূল্যছাড় দেখেই আগ্রহী হয়ে ক্রেতা পণ্য ক্রয় করতে আসে। সুতরাং তার সাথে প্রতারণা করে এটাকে সম্মতির নাম দেওয়া মারাত্মক অপরাধ।

www.al-itisam.com

প্রশ্ন (৩৩): অন্য ভাষা শিক্ষা বা শিক্ষা অর্জনের জন্য কার্টুন বা ইসলামী নাটক দেখা যাবে কি?

-আ. মালেক
নোয়াখালী।

উত্তর: ভাষা শিক্ষা বা শিক্ষা অর্জনের জন্য একাধিক বৈধ মাধ্যম রয়েছে। এক্ষেত্রে কার্টুন বা নাটক দেখা একমাত্র মাধ্যম নয়। সুতরাং এসব দেখা জায়েয নয়। কার্টুনে প্রাণীর চিত্রগ্রহণের পাশাপাশি তার চেহারা বিকৃতরূপে উপস্থাপন করা হয়, যা স্পষ্ট হারাম *(ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৫০; মুসনাদে আহমাদ, হা/৪৭৯২)*। উল্লেখ্য, ইসলামী শব্দ যুক্ত করলেই কোনো কাজ হালাল হয়ে যায় না। অতএব, ইসলামী নাটক বলে কিছু নেই।

প্রশ্ন (৩৪): স্ত্রীর উপার্জনের টাকায় স্বামীর অধিকার কতটুকু? স্বামী কি তা নিজের মতো ব্যবহার করতে পারবে?

-ইয়াসমিন
পাবনা।

উত্তর: ইসলামের দৃষ্টিতে স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব তার স্বামীর *(আল-বাকারা, ২/২৩৩; আত-তালাক্ব, ৬৫/০৭)*। স্বামীর ভরণপোষণের দায়িত্ব তার স্ত্রীর নয়। সুতরাং স্ত্রীর উপার্জিত অর্থে স্বামীর অধিকার নেই। তবে স্ত্রী চাইলে তার উপার্জিত অর্থ থেকে স্বামীকে হাদিয়া দিতে পারে এবং স্ত্রীর সম্মতিতে স্বামী সেই অর্থ নিজের মতো করে ব্যবহার করতে পারে।

প্রশ্ন (৩৫): ঈদের জামাআতে যে টাকা উত্তোলন করা হয়েছে, পুরোটা ইমামকে দেওয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে সাপ্তাহিক শুক্রবারের কৌটার টাকা ইমামকে দেওয়া হয়। প্রশ্ন হলো, এই টাকা ইমামকে দেওয়া বা তার গ্রহণ করা জায়েয হবে কি? নাকি ইমামের আলাদাভাবে বেতনের ব্যবস্থা থাকতে হবে?

-আবূ সাঈদ সাকিব
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

উত্তর: ইমামের যদি নিজস্ব সম্পদ দিয়ে ইমামতি করার সামর্থ্য না থাকে, তাহলে জনগণের টাকা দিয়ে বেতন দেওয়া যায়। ঈদের দিন উত্তোলনকৃত টাকা পরিস্থিতি অনুযায়ী সম্পূর্ণ বা আংশিক বেতন বা হাদিয়া হিসেবে দেওয়া যায়। আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আবূ বকর ছিদ্দীক রাযিয়াল্লা-হু আনহু-কে খলীফা বানানো হলো, তখন তিনি বললেন, আমার কওম জানে যে, আমার উপার্জন আমার পরিবারের ভরণপোষণে অপর্যাপ্ত ছিল না। কিন্তু এখন আমি জনগণের কাজে সার্বক্ষণিক ব্যাপৃত হয়ে গেছি। অতএব, আবূ বকরের পরিবার এই রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে খাদ্য গ্রহণ করবে এবং আবূ বকর রাযিয়াল্লা-হু আনহু মুসলিম জনগণের সম্পদের তত্ত্বাবধান করবে *(ছহীহ বুখারী, হা/১৯৪০)*।

প্রশ্ন (৩৬): জিমে গিয়ে শরীর গঠন (Bodybuilding) করা যাবে কি? রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কি Six Pack ছিল? দলীলসহ জানাবেন।

-আ. বাসেত
কুমিল্লা।

উত্তর: প্রথমত, জিমে বা অন্য কোথাও ব্যায়ামের মাধ্যমে শরীর গঠন করে সুঠাম দেহের অধিকারী হওয়া জায়েয ও প্রশংসনীয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা তাদের (কাফেরদের) মোকাবিলার জন্য যতটুকু পার শক্তি প্রস্তুত করো...' *(আল-আনফাল, ৮/৬০)*। আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লা-হু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিনের চেয়ে আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ ও অধিক প্রিয়' *(ছহীহ বুখারী, হা/২৬৬৪)*। তবে এক্ষেত্রে কিছু শর্ত রয়েছে, যেমন- (১) নিয়্যত ভালো হতে হবে (স্বাস্থ্য, শক্তি, ইবাদতে সহায়তা); (২) সতর ঢেকে রাখতে হবে; (৩) হারাম কিছু না থাকা (অশ্লীলতা, মিউজিক, ফ্রি-মিক্সিং); (৪) অহংকার/লোকদেখানো (রিয়া) না করা; (৫) ক্ষতিকর মেডিসিন গ্রহণ না করা, যেমন- স্টেরয়েড ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শরীর ছিল সুগঠিত ও শক্তিশালী। আনাস ইবনে মালিক রাযিয়াল্লা-হু আনহু নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেন, তিনি ছিলেন মাঝারি গড়নের মানুষের অন্তর্ভুক্ত, তিনি খুব লম্বা ছিলেন না, আবার খাটোও ছিলেন না *(ছহীহ বুখারী, হা/৩৫৪৭)*। বারা ইবনু আযেব রাযিয়াল্লা-হু আনহু বলেন, নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মাঝারি গড়নের এবং তার দুই কাঁধের মধ্যবর্তী দূরত্ব ছিল প্রশস্ত *(ছহীহ বুখারী, হা/৩৫৫১)*। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বুক ও পেট সমান ছিল *(শামায়েলে তিরমিযী, হা/০৭)*। Six Pack আধুনিক একটি টার্ম বা পরিভাষা। প্রশিক্ষিত জিম ট্রেইনারের তত্ত্বাবধানে লম্বা সময় নিয়ে কৃত্রিম উপায়ে পেটের উপর এই সিক্স প্যাক (ছয়টি ভাঁজ) তৈরি করা হয়। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পেটের বিবরণ সংশ্লিষ্ট হাদীছগুলোতে এমন কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। সুতরাং অনুমান করে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য সিক্স প্যাক সাব্যস্ত করা যাবে না। বরং এগুলো রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ব্যঙ্গ করার শামিল (বিস্তারিত দেখুন- রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতে যেমন ছিলেন, লেখক- আব্দুর রহিম বিন আব্দুর রাযযাক)।

www.al-itisam.com

পারিবারিক বিষয়

প্রশ্ন (৩৭): স্ত্রী মানসিকভাবে স্বামীকে অত্যাচার করে এবং বিভিন্ন সময় পূর্বের কোনো বিষয়ে খোঁটা দেয়। স্বামী কারণবশত তালাক দিতেও পারে না, আবার সহ্য করাও অসম্ভব হয়ে পড়ছে। এমতাবস্থায় স্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রহার বা কোনো মাধ্যমের সাহায্য নেওয়া যাবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: ইসলাম স্ত্রীকে কন্ট্রোলে রাখতে উপদেশ দেওয়া, বিছানা পৃথক করা ও হালকা প্রহার করার অনুমতি দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘আর স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর, তাদেরকে সদুপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা বর্জন করো এবং তাদেরকে প্রহার করো। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ অন্বেষণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহ শ্রেষ্ঠ, মহান’ *(আন-নিসা, ৪/৩৪)*। জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘তাদের উপর তোমাদের অধিকার হলো, তারা এমন কাউকে তোমাদের বিছানা মাড়াতে দেবে না, যাকে তোমরা অপছন্দ কর। এমন করলে তাদেরকে হালকাভাবে প্রহার করো। আর প্রচলিত নিয়মে তাদের খাওয়া-পরার দায়িত্ব তোমাদের উপর’ *(ছহীহ মুসলিম, হা/১২১৮)*। রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুআজ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলেন, ‘তাদের উপর থেকে আদবের লাঠি উঠাবে না’ *(মুসনাদে আহমাদ, হা/২২০৭৫)*। তিনি আরও বলেন, চাবুকটি এমন স্থানে ঝুলিয়ে রাখো, যেখানে স্ত্রী তা দেখতে পায় শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার জন্য *(ছহীহুল জামে‘, হা/৪০২১)*।

প্রশ্ন (৩৮): ভাবী তার দেবরের কাপড় ধুয়ে দিতে পারবে কি? না ধুয়ে দিলে শাশুড়ি রাগ করে। করণীয় কী?

-শারমিন
নাটোর।

উত্তর: দেবর ভাবীর কাছে মৃত্যু সমতুল্য গায়রে মাহরাম *(ছহীহ বুখারী, হা/৫২৩২; ছহীহ মুসলিম, হা/২১৭২)*। তাই তার সাথে অপ্রয়োজনীয় ঘনিষ্ঠতা বা তার খেদমত করা বাধ্যতামূলক নয়। তবে যদি পর্দা বজায় থাকে, কোনো ফিতনার আশঙ্কা না থাকে এবং শুধু পারিবারিক সহযোগিতা হিসেবে দেবরের কাপড় ধৌত করতে পারে। এই শর্তে যে, এটিকে দায়িত্ব বা বাধ্যবাধকতা বানানো যাবে না।

প্রশ্ন (৩৯): আমার এক বন্ধুর বাসায় একটি মেয়ে গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করত। পরবর্তীতে তাদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক তৈরি হয়। আমার বন্ধুর স্ত্রী ও সন্তান আছে এবং সে মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। তাই সে মেয়েটিকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করা তার পক্ষে কঠিন। তবে তারা দুজনেই একটি হালাল সম্পর্ক চায়। তাই সে মেয়েটাকে দাসী হিসেবে রাখতে চায়। এখন প্রশ্ন হলো, বিয়ে না করে এই মেয়েকে দাসী হিসেবে রেখে তার সাথে সম্পর্ক রাখা কি শরীআতসম্মত?

-মামুন খান
কক্সবাজার।

উত্তর: প্রশ্নে বর্ণিত গৃহকর্মী একজন স্বাধীন নারী। তাকে দাসী বানানোর নিয়্যত করলেই সে দাসী হয়ে যাবে না। সুতরাং তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক করা ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত, যা হারাম ও কাবীরা গুনাহ। আল্লাহ তাআলা বলেন, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ‘আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং নিকৃষ্ট পথ’ *(বনী ইসরাঈল, ১৭/৩২)*। এখন করণীয় হলো, উক্ত গৃহকর্মীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করা। কোনোভাবেই সম্ভব না হলে উক্ত গৃহকর্মীকে বাসায় রাখবে না এবং পূর্বের কৃত ব্যভিচার থেকে খালেছভাবে তওবা করবে।

প্রশ্ন (৪০): প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে কি তার বিবাহিত সুস্থ মামাকে মুখে তুলে খাইয়ে দিতে পারবে?

-শাহিদুল ইসলাম
কালিহাতী, টাঙ্গাইল।

উত্তর: ইসলামের দৃষ্টিতে আপন মামা-ভাগ্নির মাঝে মাহরামের সম্পর্ক *(আন-নিসা, ৪/২৩)*। সুতরাং আপন মামাকে মুখে তুলে খাইয়ে দিতে সমস্যা নেই। তবে প্রয়োজন ব্যতীত অন্যের সাহায্যে না খেয়ে নিজে খাওয়া উত্তম। তবে তাক্বওয়ার দাবি এটাই যে, জরুরী প্রয়োজন না হলে তুলে খাওয়াতে হবে না। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে একটা রেশমী জুব্বা হাদিয়া হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। তিনি তা পরিধান করে ছালাত আদায় করলেন। কিন্তু ছালাত শেষ হওয়ার সাথে সাথে দ্রুত তা খুলে ফেললেন, যেন তিনি তা পরা অপছন্দ করছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, ‘মুত্তাক্বীদের জন্য এই পোশাক সমীচীন নয়’ *(ছহীহ বুখারী, হা/৩৭৫)*। তথা অপ্রয়োজনীয় কথা ও কাজ থেকে বেঁচে থাকা তাক্বওয়াবানের জন্য জরুরী।

www.al-itisam.com

প্রশ্ন (৪১): ঘটনাক্রমে আমার দুই স্ত্রী হয়ে গেছে। কিন্তু আর্থিকভাবে আমি সচ্ছল না। এজন্য বাধ্য হয়ে ঢাকায় একটি রুম নিয়ে বসবাস করি। এমতাবস্থায় জানতে চাই, এভাবে থাকা বা পারিবারিক জীবন যাপন করা বৈধ হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর: প্রথমত, ইসলামে পুরুষের জন্য একসঙ্গে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের সুযোগ আছে। তবে ভরণপোষণ, আবাসন ও সার্বিক বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণের সামর্থ্য থাকতে হবে। অনথ্যায় একাধিক বিবাহ করা যাবে না *(আন-নিসা, ৪/৩)*। এজন্য উভয়ের আলাদা রুম বা আলাদা বিছানার ব্যবস্থা করতে হবে। আর এক স্ত্রীর সামনে অন্য স্ত্রীর সাথে শারীরিক সম্পর্ক করা যাবে না। কেননা এক স্ত্রীর সতর (লজ্জাস্থান) অপর স্ত্রীর সামনে প্রকাশ হওয়া জায়েয নেই। এছাড়া এটি শালীনতা ও লজ্জাশীলতার পরিপন্থী। রাসূল a বলেন, 'প্রত্যেক ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। ইসলামের বৈশিষ্ট্য হলো লজ্জাশীলতা' *(ইবনু মাজাহ, হা/৪১৮২)*। এমতাবস্থায় আল্লাহর কাছে বেশি বেশি বরকতের দু'আ করতে হবে।

নারী বিষয়ক

প্রশ্ন (৪২): নারী নেতৃত্ব কি হারাম? কেননা কুরআনে নারী শাসক বিলকিসের কথা এসেছে। এছাড়া আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা উষ্ট্রীর যুদ্ধে নেতৃত্বে ছিলেন।

-মুহিবুল্লাহ
নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর: প্রথমত, পুরুষদের জন্য কোনো নারীকে তাদের সমাজ বা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হারাম। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 'কখনোই সফল হবে না সেই জাতি, যারা তাদের (সমাজ বা রাষ্ট্র) পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করে কোনো নারীকে' *(ছহীহ বুখারী, হা/৪৪২৫)*। দ্বিতীয়ত, কুরআন কারীমে নারী শাসক বিলকিসের কথা বর্ণিত হয়েছে এভাবে যে, সে ও তার জাতির লোকেরা সূর্যকে সিজদা করত এবং তারা কাফের ছিল *(আন-নামল, ২৭/২৪ ও ৪৩)*। সুতরাং তার ঘটনা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। তৃতীয়ত, উষ্ট্রীর যুদ্ধে আয়েশা রাযিয়াল্লা-হু আনহা নেতৃত্বের জন্য বের হননি, তিনি কোনো নেতৃত্ব দাবি করেননি এবং নেতৃত্ব গ্রহণও করেননি; বরং তিনি উছমান রাযিয়াল্লা-হু আনহু-এর হত্যার বিচারের জন্য বের হয়েছিলেন *(ইরশাদুস সারী লিল কাসত্বলানী, ১৫/৪৯)*। সুতরাং এটি নারী নেতৃত্বের প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

আশূরা-মুহাররম

প্রশ্ন (৪৩): আমার বাড়ি চট্টগ্রাম। প্রতিবছর আমাদের এখানে আশূরায় কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনা স্মরণে সাদা-কালো পোশাকে হাজারো মানুষের অংশগ্রহণে তাযিয়া মিছিলে 'হায় হোসেন, হায় হোসেন' ধ্বনিতে শোকের মাতম ওঠে। এই মিছিলে অংশগ্রহণ করা যাবে কি?

-গোলাম মুস্তাকিম
চট্টগ্রাম।

উত্তর: না, এই মিছিলে অংশ নেওয়া যাবে না। কোনো মুসলিম মৃত্যুবরণ বা শাহাদতবরণ করলে তার জন্য মৃত্যুবার্ষিকী পালন বা শোক মিছিলের বিধান ইসলামে নেই। সুতরাং এই দিনে শোক দিবস পালন বা তাযিয়া মিছিল করা বৈধ নয়। এছাড়া এই দিবসকে কেন্দ্র করে অনেকে 'হায় হোসেন' 'হায় হোসেন' বলে বিলাপ করেন, বুক চাপড়ায় এবং মাথায় কালো কাপড় বেঁধে শোক প্রকাশ করে, যা সম্পূর্ণভাবে হারাম ও কাবীরা গুনাহ। আরও এদিনে ধারালো জিনিস দিয়ে নিজের দেহে আঘাত করে রক্তাক্ত করা এবং নিজের গায়ের কাপড় ছিঁড়ে ফেলা ইসলাম বহির্ভূত কাজ। রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যারা শোকে মুখে চপেটাঘাত করে, জামা ছিড়ে ফেলে ও জাহেলী যুগের মতো চিৎকার করে, তারা আমাদের দলভুক্ত নয়' *(ছহীহ বুখারী, হা/১২৯৭)*। বরং আশূরায় রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ অনুযায়ী মূসা আলাইহিস সালাম-এর নাজাতের জন্য দুই দিন ছিয়াম পালন করতে হবে, যাতে পূর্বের এক বছরের গুনাহ ক্ষমা করা হবে *(ছহীহ মুসলিম, হা/১১৬২)*।

প্রশ্ন (৪৪): আশূরা উপলক্ষে যবেহকৃত গরুর গোশত খাওয়া যাবে কি?

-মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম আশেক
কুতুবদিয়া, কক্সবাজার।

উত্তর: আশূরা উপলক্ষে গরু যবেহ করা বিদআত। সুতরাং এর গোশত খাওয়া জায়েয নয় *(মাজমূউল ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিয়্যাহ, ২৫/৩১৩)*।

প্রশ্ন (৪৫): মুহাররম ও আশূরা মানে কী? আমরা এদিনে ছিয়াম পালন করব কেন?

-আ. হান্নান
ঠাকুরগাঁও।

উত্তর: মুহাররম মানে নিষিদ্ধ বা সম্মানিত। এ মাসে যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে এটি আল্লাহর ৪টি সম্মানিত মাসের একটি, যাকে অভিহিত করা হয়েছে 'শাহরুল্লাহিল মুহাররম' নামে। আর আরবী আশারা (عشر) শব্দ থেকে এসেছে

www.al-itisam.com

আশূরা (عاشوراء)। আশারা অর্থ দশ আর আশূরা অর্থ দশম, মাসের দশম দিন। অর্থাৎ হিজরী সনের প্রথম মাস মুহাররমের দশ তারিখকে আশূরা বলা হয়। এদিন মহান আল্লাহ মূসা আলাইহিস সালাম ও তার কওমকে অত্যাচারী বাদশাহ ফেরাউনের কবল থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং ফেরাউনকে ও তার লোকদেরকে ডুবিয়ে মেরেছিলেন। এজন্য মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে ছিয়াম পালন করেছেন। ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আসেন, তখন দেখতে পেলেন ইয়াহূদীরা আশূরা দিবসে ছিয়াম পালন করে। তাদেরকে ছিয়াম পালনের কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলল, এ দিনে আল্লাহ তাআলা মূসা আলাইহিস সালাম ও তার সম্প্রদায়কে মুক্তি দিয়েছেন এবং ফেরাউন ও তার কওমকে ডুবিয়ে দিয়েছেন। এরপর মূসা আলাইহিস সালাম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার লক্ষ্যে এই দিনে ছওম পালন করেছেন, তাই আমরাও এ দিনে ছওম পালন করছি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমাদের চেয়ে আমরা মূসা আলাইহিস সালাম-এর বেশি হক্বদার'। এরপর তিনি ছিয়াম পালনের নির্দেশ দিলেন *(ছহীহ বুখারী, হা/৩৯৪৩; ছহীহ মুসলিম, হা/১১৩০)*।

বিবিধ

প্রশ্ন (৪৬): জিনের আছর কীভাবে বুঝা যাবে? এর নির্দিষ্ট কোনো লক্ষণ আছে কি? জিন কি মানুষের দেহে ভর করতে পারে?

-সুমাইয়া
বগুড়া।

উত্তর: মানুষের উপর জিনের প্রভাব আছে। তবে জিনের আছর (প্রভাব) বুঝার জন্য নির্দিষ্ট কোনো লক্ষণ নেই, কারণ এটি ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন হতে পারে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যারা সূদ খায়, তারা তার ন্যায় (কবর থেকে) উঠবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দেয়' *(আল-বাকারা, ২/২৭৫)*। অর্থাৎ তার সঙ্গে একটি শয়তান নিযুক্ত করা হবে। তাকে পাগলের মতো অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে। এই আয়াতটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, যারা জিনের প্রভাবজনিত আচ্ছন্নতা অস্বীকার করে এবং একে কেবল শারীরিক স্বভাবগত কারণ বলে মনে করে, তাদের ধারণা ভ্রান্ত। তারা আরও মনে করে যে, শয়তান মানুষের ভেতরে প্রবেশ করে না এবং তার কোনো প্রভাব মানুষের উপর পড়ে না— তাদের এ কথাও সঠিক নয় *(তাফসীরে কুরতুবী, ৩/৩৫৫)*। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেন, 'নিশ্চয় শয়তান আদম সন্তানের রক্তের শিরা-উপশিরার মধ্যে বিচরণ করে থাকে' *(ছহীহ বুখারী, হা/২০৩৮)*।

প্রশ্ন (৪৭): শুনেছি, শীআরা নাকি ইমাম আবূ হানীফার লাশ কবর থেকে তুলে সেখানে কুকুরের লাশ দাফন করেছে এবং তার কবরকে নাকি টয়লেট বানানো হয়েছে। এ ঘটনা কি সঠিক?

-মোস্তফা মনোয়ার
হারাগাছ, রংপুর।

উত্তর: এসব বিষয়ের পক্ষে কোনো ছহীহ ইতিহাসগ্রন্থ, নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিছ বা স্বীকৃত ইতিহাসবিদের দলীল নেই। এসব কথা একজন সম্মানিত, সুদক্ষ, বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিকে সামাজিকভাবে অপমান করার নোংরা কৌশলমাত্র।

প্রশ্ন (৪৮): অনেক সময় শোনা যায়, ছেলে মেয়ে হয়ে গেছে বা মেয়ে ছেলে হয়ে গেছে। শরীআত এ ব্যাপারে কী বলে?

-ববিতা ইসলাম
গাইবান্ধা।

উত্তর: কোনো সন্তান ছেলে না মেয়ে হবে তা নির্ধারিত হয় মায়ের পেটে অবস্থানকালীন সময়ে *(ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৪৫)*। লিঙ্গ জন্মগতভাবে আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা দেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র দেন' *(আশ-শূরা, ৪২/৪৯)*। কিছু মানুষ শয়তানের প্ররোচনায় তাদের দেহের পরিবর্তন ঘটিয়ে পুরুষ নারীতে রূপান্তরিত হয় বা নারী পুরুষে রূপান্তরিত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি (শয়তান) তাদেরকে আদেশ দেব, ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন করবে' *(আন-নিসা, ৪/১১৯)*। যারা সৃষ্টির পরিবর্তন করে তাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম লানত করেছেন *(ছহীহ বুখারী, হা/৫৯৩১)*। আর যদি বাস্তবেই ছেলে মেয়ে বা মেয়ে ছেলে হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তা ঘটাতে সক্ষম। তিনি বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান' *(আল-বাকারা, ২/২০)*।

প্রশ্ন (৪৯): আমি এক স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে দেখেছি, প্রায় প্রতিদিন তারা খাবার অপচয় করে এবং নষ্ট করে। এক্ষেত্রে যারা নষ্ট করে তারা এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে কি?

-কবিরুল ইসলাম
রাজশাহী।

উত্তর: কোনো ব্যক্তি, পরিবার বা প্রতিষ্ঠানের জন্য উচিত নয় খাবার অপচয় এবং নষ্ট করা। আল্লাহ তাআলা খাবার অপচয় এবং নষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমরা খাও এবং পান করো, কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না' *(আল-আ'রাফ, ৭/৩১)*। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করার পরেও যদি খাবার নষ্ট করা প্রতিরোধ করতে না পারে, তাহলে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ দায়ী হবে

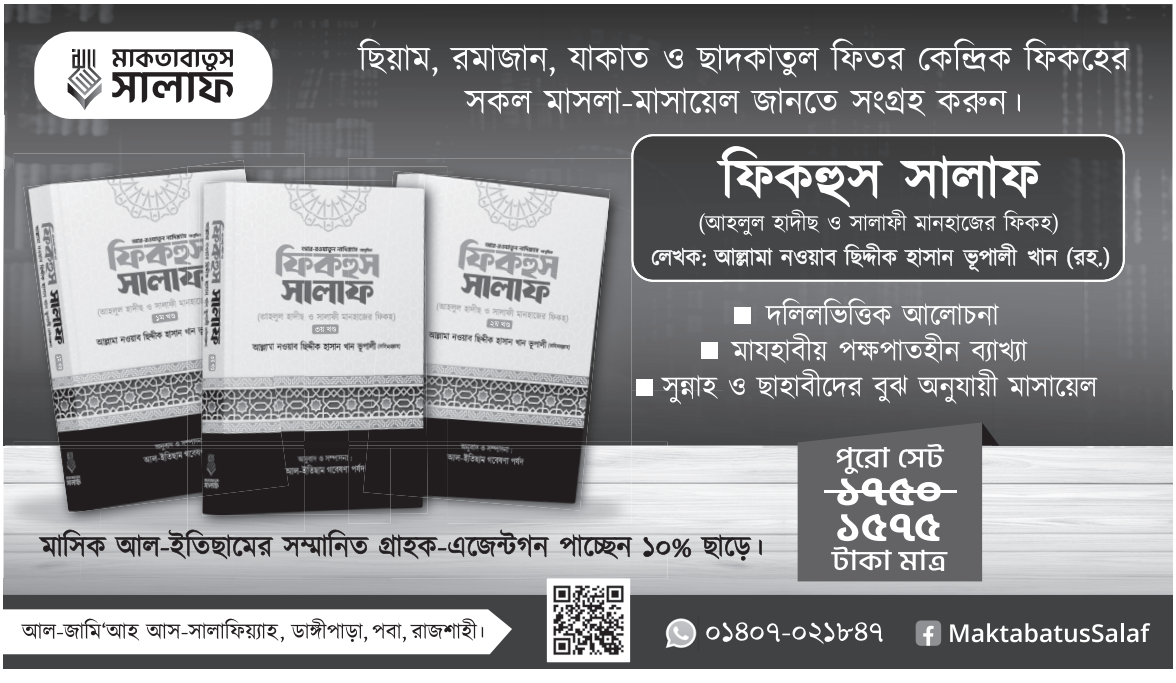
www.al-itisam.com

না। আর যদি প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ খাবার নষ্ট করা প্রতিরোধের পদক্ষেপ না নেই, তাহলে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ দায়ী হবে।

প্রশ্ন (৫০): একজন ব্যক্তি সরকারি চাকরিকালীন অডিট করতে গিয়ে কিছু টাকা ঘুষ হিসেবে পায়, তা দিয়ে সাংসারিক প্রয়োজনে খরচ করেছে। বর্তমানে তওবা করেছে যে আর ঘুষ খাবে না। এমতাবস্থায় আগের ঘুষের টাকা সেই ব্যক্তিকে ফেরত দিতে হবে কি? তার করণীয় কী?

-মো. মেহেদী ইসলাম
বগুড়া।

উত্তর: ঘুষদাতা ও গ্রহীতা উভয়েই অভিশপ্ত *(আবূ দাঊদ, হা/৩৫৮০)*। এক্ষেত্রে এই ব্যক্তিকে এখন তওবা করতে হবে। তওবার অন্যতম একটি শর্ত হচ্ছে যদি সে কারো হক অন্যায়ভাবে নিয়ে থাকে, তাহলে তা তাকে ফেরত দেওয়া। সুতরাং উক্ত ব্যক্তির উচিত হবে ঘুষের টাকা সেই ব্যক্তিকে ফেরত দেওয়া। আবূ হুমাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনুল উতাবিয়্যা-কে বনূ সুলাইম গোত্রের যাকাত সংগ্রহের দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি (দায়িত্ব শেষে) ফিরে এসে হিসাব দিলে বললেন, এটা আপনাদের জন্য, আর এটা আমাকে উপহার দেওয়া হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি সত্যবাদী হলে কেন তোমার পিতা-মাতার ঘরে বসে থাকলে না? তাহলে (দেখা যেত) তোমার কাছে এই উপহার আসে কি না! *(ছহীহ বুখারী, হা/৭১৯৭)*।





www.al-itisam.com

মাকতাবাতুস সালাফ

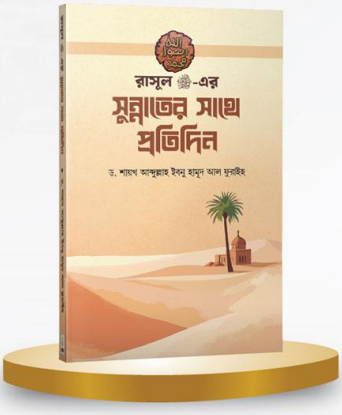
রাসূল ﷺ-এর সুন্নাতের সাথে প্রতিদিন

ড. শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনু হামূদ আল ফুরাইহ

মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-এর পথনির্দেশনা অনুসরণ করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। তিনি শুধু ইবাদতের ক্ষেত্রেই নয়, বরং দৈনন্দিন জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ে আমাদের জন্য আদর্শ রেখে গেছেন।

এই বইটিতে রাসূল ﷺ-এর দৈনন্দিন জীবনের সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ও সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন সব সুন্নাতগুলো সহজভাবে ধারাবাহিক আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন: ছালাতের সুন্নাত, ঘুমানোর আগে ও পরে সুন্নাত, সকাল-সন্ধ্যার সুন্নাত, দু'আর সুন্নাত ইত্যাদি। প্রত্যেকটি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ নির্ভরযোগ্য তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে পাঠক সহজে তা বুঝতে পারেন।

আমরা আশা করি, এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা পাঠকদের মধ্যে সুন্নাতের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করবে এবং তাদের জীবন আলোকিত করবে। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন এবং এই বইকে আমাদের জন্য ছাদাক্বায়ে জারিয়াহর মাধ্যম বানান- আমীন!



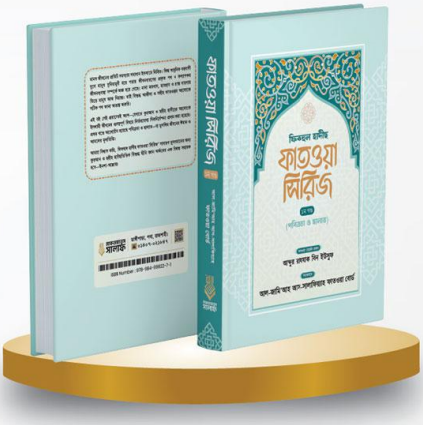
পৃষ্ঠা: ১৪৪

মূল্য: ১৩০৳

ফিকহুল হাদীছ ফাতওয়া সিরিজ

সংকলনে: আল-জামিআহ আস সালাফিয়্যাহ ফাতওয়া বোর্ড

বোর্ড প্রধান: আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ



পৃষ্ঠা: ৪৬৪

মূল্য: ৫৮০৳

ইসলামী জীবনের প্রথম শর্ত পবিত্রতা, আর তার সর্বোচ্চ প্রকাশ সালাত। এই দুই ইবাদতের শুদ্ধতা ছাড়া ঈমান পরিপূর্ণ হয় না। "ফিকহুল হাদীস ফাতওয়া সিরিজ"-এর এই প্রথম খণ্ডে সংকলিত হয়েছে আল-ইতিছাম-এ প্রকাশিত দলিলভিত্তিক ফাতওয়াগুলোর বাছাইকৃত অংশ, সাথে সংযোজিত হয়েছে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক ও সমসাময়িক বিষয়।

পুরো গ্রন্থজুড়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে পবিত্রতা ও সালাত-সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত অথচ প্রামাণ্য উত্তর উপস্থাপন করা হয়েছে। ওযু, গুসল, নাপাকি, মহিলাদের মাসিক অবস্থা, সালাতের রুকন ও শর্ত, জামাআত, ইমামতি, ভ্রমণকালীন নামায-সবই এখানে সাজানো হয়েছে দলিল ও ফিকহি বিশ্লেষণের আলোকে।

এই সংকলন পাঠককে ইবাদতের সঠিক অনুশীলনে সহায়ক ও শরঈ নির্দেশনা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে, ইনশাআল্লাহ।

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ, ডাঙ্গীপাড়া, পবা, রাজশাহী। ০১৪০৭-০২১৮৪৭ MaktabatusSalaf

www.al-itisam.com

Monthly Al-Itisam الاعتصام 10 th Year, 8th Part, June 2026, Price : 30.00

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত

প্রতিষ্ঠানসমূহে সহযোগিতা করতে নিচের ব্যাংক হিসাবসমূহ ব্যবহার করুন

অনুদান প্রেরণের হিসাব নম্বর সমূহ

আবাসিক ও একাডেমিক ভবন নির্মাণ, জমি ক্রয়, শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ জেনারেল ফান্ড

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৭০১

নগদ নং- ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭ (পারসোনাল)

দুস্থ ও ইয়াতীম কল্যাণ কার্যক্রমের জন্য

নিবরাস ইয়াতিম কল্যাণ ফান্ড

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৬০০

নগদ নং- ০১৪০৭-০২১৮০০ (পারসোনাল)
রকেট নং- ০১৭৮৪-২১৩১৭৮-৫ (পারসোনাল)
বিকাশ নং- ০১৯০৪-১২২৫৪৬ (এজেন্ট)

আদ দাওয়াহ ইলাল্লহ মক্তব কার্যক্রমের জন্য

মক্তব ফান্ড

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং-২০৫০ ৭৭৭০ ১০০৬ ৫৮৪২৩

নগদ নং- ০১৯৫৮-১৫৩৭২০ (মার্চেন্ট)

মসজিদ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য

বায়তুল হামদ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স ফান্ড

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৩১৬

বিকাশ নং- ০১৯৭৪-০৮৮৯৬৭ (মার্চেন্ট)

মানবসেবামূলক কার্যক্রমের জন্য

নিবরাস ত্রাণ তহবিল ফান্ড

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৯০৩

বিকাশ, নগদ ও রকেট নং- ০১৮৩৫-৯৮৪৬৪৮ (পারসোনাল)

যাকাতের জন্য

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ যাকাত ফান্ড

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, রাজশাহী শাখা।
হিসাব নং- ২০৫০ ১১৩০ ২০৪৩ ৬৭৪১৭

বিকাশ নং- ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫ (পারসোনাল)

নিবরাস ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বীরহাটাব-হাটাব, বিরাব, রুপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। মোবাইল : ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭

আল-জামি'আহ আস-সালাফিয়্যাহ
নারায়ণগঞ্জ, রাজশাহী, দিনাজপুর। মোবা: ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭, ০১৭৭৩-৯২৫২৩৫

www.al-itisam.com